মাসিক
আল-আবরার
The Monthly AL-ABRAR
রেজি: নং- ১৪৫ বর্ষ-২, সংখ্যা-১২

الأبرار
مجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية

জানুয়ারী ২০১৪ইং, রবিউল আওয়াল ১৪৩৫হি:, পৌষ ১৪২০বাং
ربيع الاول ١٤٣٥ يناير ٢٠١٤م

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক
ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (দামাত বারাকাতুহুম)
প্রধান সম্পাদক
মুফতী আরশাদ রহমানী
সম্পাদক
মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক
নির্বাহী সম্পাদক
মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী
সহকারী সম্পাদক
মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
মুহাম্মদ হাশেম
সার্কুলেশন ম্যানেজার
হাফেজ আখতার হোসাইন

সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা
মুফতী জামাল উদ্দীন
মুফতী এনামুল হক্ব কাসেমী
মুফতী মাহমূদুল হক্ব
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মুফতী আব্দুস সালাম
মাওলানা হারুন
মুফতী রফীকুল ইসলাম আল-মাদানী
মুফতী জা'ফর আলম কাসেমী

বিনিময়: ২০ (বিশ) টাকা মাত্র
প্রচার সংখ্যা : ১০,০০০ (দশ হাজার)

যোগাযোগ

সম্পাদনা দফতর
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
ব্লক-ডি, ফক্বীহুল মিল্লাত সরণি, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।
ফোন: ০২৮৪০২০৯১,০২৮৮৪৫১৩৮
ইমেইল :monthlyalabrar@gmail.com
ওয়েব : www.monthlyalabrar.com
www.monthlyalabrar.wordpress.com

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ২
পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে :..... ৩
পবিত্র সুন্নাহ থেকে : ৪
দরসে ফিকহ:
শরীয়তের আলোকে রাওজা পাকের যিয়ারত ৫
মুফতী শাহেদ রহমানী
হযরত হারদূয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী ৭
মাওয়ায়েযে ফক্বীহুল মিল্লাত : ইসলামী বিয়ে-১১... ৮
"সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরলপথ: বিভ্রান্তি ও নিরসন-৫
বিতির নামায এক সালামে ৩ রাকআত..... ১১
মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক্ব
নবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী..... ১৪
মাওলানা মুহিউদ্দীন খান
সীরাতে রাসূল (সা.)-এর আলোকে
সমসাময়িক সমস্যার সমাধান..... ১৬
মাওলানা আনওয়ার হুসাইন
সুন্নতি আদর্শ ও আজকের দাবি ২৩
মাওলানা আবদুর রহীম ইসলামাবাদী
মক্কা বিজেতার অনুকম্পা..... ২৪
মুফতী শরীফুল আজম
নবী (সা.)-এর অনুসরণের সঠিক পন্থা–
পূর্বপুরুষদের অনুকরণ ২৯
মাও: উবাইদুর রহমান খান নদভী
জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান ৩৪
নবী চরিত্রের কিছু অনন্য সৌন্দর্য ৩৮
হাফেজ রিদওয়ানুল কাদির উখিয়াভী
সীরাতের একটি নিভৃত অধ্যায় 'রাবায়েবুন্নবী' (সা.). ৪৪
মাও. রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

মোবাইল: প্রধান সম্পাদক: ০১৮১৯৪৬৯৬৬৭, সম্পাদক:০১৮১৭০০৯৩৮৩, নির্বাহী সম্পাদক: ০১১৯১২৭০১৪০ সহকারী সম্পাদক: ০১৮৫৫৩৪৩৪৯৯
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি: ০১৭১১৮০৩৪০৯, সার্কুলেশন ম্যানেজার : ০১১৯১৯১১২২৪

সম্পাদকীয়

সংকট উত্তরণের সঠিক উপায় কী?

সমস্যা, সহিংসতায় জর্জরিত এবং বিভিন্ন ফিৎনায় বিধ্বস্ত একটি জনপদ এখন আমাদের এই জন্মভূমি। দেশের হালচিত্র দেখলে মনে হবে না এটি বিশ্ব মানচিত্রের সে শান্তি-সুখের অপরূপ বাংলাদেশ, যার ইতিহাস-ঐতিহ্য সারা দুনিয়ায় স্বীকৃত। যাকে বিশ্বের দ্বিতীয় মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবেই চেনা হয়। মানুষের দৈনন্দিন নিরাপত্তা, স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সবই যেন শঙ্কার মুখে, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় শ্বাসরুদ্ধকর যেন প্রতিটি মুহূর্ত। এমনটা কারো ব্যক্তিগত কারণে হোক বা দলীয় কারণে, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অবক্ষয় বা যে কোনো কারণেই হোক– নিশ্চিত কথা হলো এভাবে একটি দেশ চলতে পারে না। এর দ্বারা যেমন দেশের জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, বিশ্ব দরবারে এই দেশের সম্মান এবং ঐতিহ্য নানাভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হতে চলেছে।

একটি মুসলিম দেশের জন্য উল্লেখিত অবস্থাটা খুবই দুঃখজনক। কারণ মুসলমানদের আছে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নিপূণ আদর্শ, অনন্য চরিত্র। যে আদর্শ একটি চরম বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত, সর্বস্বান্ত দেশকেও পূণর্গঠনের ক্ষেত্রে সফল ভুমিকা রাখতে সক্ষম। যে আদর্শে আছে বাস্তব নমূনা। যে আদর্শ চর্চায় জাহেলিয়্যাতের চরম বিপর্যয় থেকে মুক্তি পেয়েছে দুনিয়ার মানুষ। যে আদর্শকে বলা হয় মানবতার মুক্তির গ্যারান্টি।

সুতরাং সমস্যা সঙ্কুল অধঃপতিত অবস্থাতেও মুসলমানদের ভেবে দেখতে হবে ফিৎনার সময় তাদের করণীয় কী? মুসলমানদের পর্যুদস্ত অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য মহানবী (সা.) এর বাস্তব আদর্শ কি এবং কোন ধরনের দিক নির্দেশনা তিনি দিয়েছেন।

হাদীস শরীফে এসেছে–

عن ابى هريرة رض قال قال رسول الله ﷺ المتمسك بسنتى عند فساد امتى له اجر شهيد (رواه الطبرانى فى الاوسط)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের ফাসাদের সময় যে আমার সুন্নাত ও তরীকা শক্তভাবে আঁকড়ে থাকবে, তাঁর জন্য রয়েছে শহীদের সাওয়াব। (তাবরানী আওসাত)

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এর একটি হাদীস থেকে বোঝা যায়, রাসূল (সা.) এর উপর প্রতিভাত করা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী উম্মতদের ন্যায় তাঁর উম্মতে ফাসাদ এবং অনৈক্য আসবে। আর এমন যুগও আসবে যখন উম্মতের পথভ্রষ্টতা আর প্রবৃত্তি ও শয়তানের অনুসরণ অতি সাধারণ হয়ে যাবে। তখন তাদের অধিকাংশ তাঁর হিদায়াত ও তালীম ছেড়ে দেবে এবং তাঁর তরীকায় প্রতিষ্ঠিত থাকবে না। রাসূল (সা.) বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বানীমূলক হাদীসসমূহে কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতের মধ্যে কি কি বিপর্যয় ঘটতে পারে তার বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। সেসব বর্ণনাকে হাদীস বিশারদগণ কিতাবুল ফিতান নামে শিরোনাম দিয়ে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। বলাই বাহুল্য, এরূপ মন্দ পরিবেশ ও প্রতিকুল অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা.) এর হিদায়াত, সুন্নাত ও শরীয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে জীবন যাপন করা খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে। সেরূপ বিপদসঙ্কুল অবস্থায় কি করতে হবে তা বিবৃত হয়েছে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) এর আলোচ্য হাদীস শরীফে। এতে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, যাবতীয় ফিৎনা সেটা যে রূপেই আসুক নবীজি (সা.)-এর সুন্নাতের উপর দৃঢ়পদ থাকাই এর সমাধান। বরং এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সুন্নাত ও হেদায়াতের উপর দৃঢ়পদ থাকতে পারলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়ার সওয়াব প্রদানের কথা বলা হয়েছে।

সুন্নাত অর্থ হলো রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পরিপূর্ণ হিদায়াত এবং তাঁর তরীকা। যে হিদায়াতে মানবজাতির প্রতিটি ক্ষেত্র ও বিভাগের সুষ্ঠু পরিচালনায় দিকনির্দেশনা রয়েছে। যা অনুসরণে মানুষের ব্যক্তিগত জীবন সুন্দর হবে, সামাজিক জীবন সমৃদ্ধশালী হবে, রাজনৈতিক জীবন সুস্থ হবে, অর্থনৈতিক অবকাঠামো সুষ্ঠু হবে।

আজ যদি কারো ব্যক্তিগত কারণে ফিৎনা সৃষ্টি হয়, মহানবীর (সা.) দিকনির্দেশনায় তা সমাধানের সুন্দর থেকে সুন্দর ব্যবস্থাপনা আছে। যদি রাজনৈতিক অসুস্থতার কারণে হয়, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সুন্নাতে তা সুস্থ করার বিহিত ব্যবস্থা রয়েছে। অর্থনৈতিক কারণে হয়ে থাকলে তারও সমাধান এতে রয়েছে। এক কথায় কিয়ামত পর্যন্ত আগন্তুক মানুষের এমন কোনো বিষয় বা সমস্যা নেই যার সমাধান এবং দিক নির্দেশনা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রবর্তিত হেদায়াতে নেই।

এই কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা.) দেড় হাজার বছর পূর্বে ঘোষণা করতে পেরেছেন, যে কোনো বিপর্যয় ও ফিৎনার সময়ও আমার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরো। কুরআন ও হাদীসকে শক্ত করে দাঁত দ্বারা কামড়ে ধরো ইত্যাদি। এটিই হলো আমাদের যাবতীয় সমস্যার সমাধান।

আলোচ্য হাদীসকে আমলে আনতে হলে আমাদেরকে সুন্নাতে রাসূল তথা রাসূল (সা.) এর হেদায়াত সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বাস্তব সীরাত ও শামায়েল সম্পর্কে জানতে হবে। তাঁর দিক নির্দেশনা ও বাস্তব আদর্শের উপর নিজেদের গড়ে তুলতে হবে। তখন সমস্যার সমাধান তো হবেই, এক সময় দেখা যাবে কোনো সমস্যাই সৃষ্টি হচ্ছে না।

মহানবী (সা.)-এর আগমনের মাস রবিউল আওয়াল মাসে আমাদের সংকল্প হোক যাবতীয় সমস্যা সমাধানে তাঁর সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা।

আরশাদ রহমানী, ঢাকা।
২৭/১২/২০১৩

পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে

উচ্চতর তাফসীর গবেষণা বিভাগ :
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

নিশ্চয় আল্লাহ ন্যাপরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালঙ্ঘন; তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় বান্দাদেরকে ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয় স্বজনের প্রতি দানের নির্দেশ দিচ্ছেন, যদিও প্রতিশোধ গ্রহণও জায়েয। যেমন তিনি বলেন–

وان عـاقبتـم فـعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين

যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করো তবে সমান সমানভাবে প্রতিশোধ গ্রহণ করো। আর যদি ধৈর্য ধারণ করো তবে ধৈর্যশীলদের জন্যে এটা বড়ই উত্তম কাজ। (১৬: ১২৬) অন্য আয়াতে আছে, মন্দের বদল সমপরিমাণ মন্দ, আর যে মাফ করে দেয় ও মীমাংসা করে নেয়, তার প্রতিদান আল্লাহর নিকট রয়েছে। আর একটি আয়াতে আছে, যখমের কিসাস রয়েছে, কিন্তু যে ক্ষমা করে দেয়, ওটা তার জন্য গুনাহ মাফের কারণ। সুতরাং ন্যায়পরায়ণতা তো ফরজ, আর ইহসান নফল। কালেমায়ে তাওহীদের সাক্ষ্য দেওয়াও আদল। বাহির ও ভিতর এক হওয়াও আদল। আর ইহসান এই যে, ভিতরের পরিচ্ছন্নতা বাইরের চেয়েও বেশি হবে। ফাহসা এবং মুনকার হচ্ছে ভিতর অপেক্ষা বাহির বেশি সুন্দর হওয়া।

আল্লাহ তা'আলা আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখারও নির্দেশ দিচ্ছেন। যেমন স্পষ্টভাষায় রয়েছে وات ذا القربى حقه

আত্মীয়স্বজন, মিসকীন ও মুসাফিরদেরকে তাদের হক দিয়ে দাও এবং অপচয় করো না। আর তিনি অশ্লীলতা, অসৎকর্ম ও সীমালঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেছেন। প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সমস্ত অশ্লীলতা হারাম এবং লোকদের উপর যুলুম ও বাড়াবাড়ি করাও হারাম। যেমন হাদীসে এসেছে যুলুম ও সীমালঙ্ঘন অপেক্ষা এমন কোনো বড় গুনাহ নেই যার জন্যে দুনিয়াতেই তাড়াতাড়ি শাস্তি দেয়া হয় এবং পরকালে কঠিন শাস্তি জমা থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, এই আদেশ ও নিষেধ তোমাদের জন্য উপদেশ স্বরূপ যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন যে, গোটা কুরআনের ব্যাপক অর্থজ্ঞাপক আয়াত হচ্ছে সূরায়ে নাহালের এই আয়াতটি। কাতাদা (রা.) বলেন যে, যত ভালো স্বভাব আছে সেগুলো অবলম্বনের নির্দেশ কুরআন দিয়েছে এবং মানুষের মধ্যে যে সব খারাপ স্বভাব রয়েছে সেগুলো পরিত্যাগ করতে আল্লাহ তা'আলা হুকুম করেছেন। হাদীসে রয়েছে যে, উত্তম চরিত্র আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন এবং অসচ্চরিত্র তিনি পছন্দ করেন না।

আব্দুর মালিক ইবনে উমাইর (রা.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, হযরত আকসাম ইবনে সাইফীর (রা.) নিকট নবীর (সা.) আবির্ভাবের খবর পৌঁছে। তিনি তাঁর কাছে গমন করার স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর কওম তাঁর এই পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তিনি তখন তাদেরকে বলেন, তোমরা আমাকে তাঁর কাছে যেতে না দিলে এমন লোক আমার কাছে হাজির কর যাদেরকে আমি দূত হিসেবে তাঁর নিকট প্রেরণ করব। তাঁর কথা অনুযায়ী দুজন লোক এ কাজের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। তাঁরা নবীর (সা.) নিকট হাজির হয়ে আরজ করেন, আমরা আকসাম ইবনে সাইফীর (রা.) দূত হিসেবে আপনার নিকট আগমন করেছি। অতঃপর তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কে এবং আপনি কি? তিনি উত্তরে বলেন, তোমাদের প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই যে, আমি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। অতঃপর তিনি ان الله يـامـر بـالعدل الخ এই আয়াতটি পাঠ করেন। তাঁরা বলেন, পুনরায় পাঠ করুন। তিনি আবার পাঠ করেন। তাঁরা তা মুখস্থ করে নেন এবং ফিরে গিয়ে আকসামকে (রা.) সমস্ত খবর অবহিত করেন। তাঁরা তাঁকে বলেন তিনি নিজের বংশের কোনো গৌরব প্রকাশ করেননি। শুধু নিজের নাম ও পিতার নাম বলেছেন। অথচ তিনি অতি সম্ভ্রান্ত বংশের লোক। তিনি আমাদেরকে যে কথাগুলো শিখিয়ে দিয়েছেন তা আমরা মুখস্থ করে নিয়েছি। অতঃপর তাঁকে তা শুনিয়ে দেন। কথাগুলো শুনে আকসাম (রা.) বলেন, তিনি তো তাহলে খুবই উত্তম ও উন্নত মানের কথা শিখিয়ে থাকেন। আর তিনি খারাপ অশ্লীল কথা ও কাজ থেকে বিরত রাখেন। হে আমার কওমের লোকেরা! তোমরা ইসলামের অগ্রগামী হও। তাহলে তোমরা নেতৃত্ব লাভ করবে এবং অন্যদের গোলাম হয়ে থাকবে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) একদা বাড়ির উঠানে বসে ছিলেন। এমন সময় হযরত উসমান ইবনু মাযউম (রা.) তাঁর পার্শ্ব দিয়ে গমন করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে বলেন, বসছো না কেন? তিনি তখন বসে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর সাথে কথা বলতে ছিলেন। হঠাৎ তিনি (নবী সা.) তাঁর দৃষ্টি আকাশের দিকে উত্তোলন করেন। কিছুক্ষণ ধরে তিনি উপরের দিকেই তাকাতে থাকেন।

(বাকী অংশ ৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পবিত্র সুন্নাহ থেকে

উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

কয়েকটি মুনাফেকসূলভ কর্ম ও চরিত্র

عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله ﷺ اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا اوتمن خان واذا حدث كذب و اذا عاهد غدر واذا خاصم فجر (رواه البخارى ومسلم)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, চারটি এমন স্বভাব রয়েছে যে, যার মধ্যে এ চারটিরই সমাবেশ ঘটে, সে নির্ভেজাল মুনাফেক। আর যার মধ্যে এর চারটি থেকে কোনো একটি স্বভাব পাওয়া যায়, তার মধ্যে মুনাফেকীর একটি স্বভাব থাকে, যে পর্যন্ত না সে এটা ছেড়ে দেয়। ১. আমানতের রক্ষক হলে খেয়ানত করে। ২. প্রায়শই মিথ্যা বলে। ৩. যখনই প্রতিজ্ঞা ও চুক্তি করে তা ভেঙ্গে ফেলে। ৪. যখনই কারো সাথে ঝগড়া বিবাদ করে, তখনই গালিগালাজ করে। (বুখারী ৩৪, তিরমিযী ২৬৩২)

ব্যাখ্যা: প্রকৃত মুনাফেকী তো মানুষের সেই নিকৃষ্টতর অবস্থার নাম যে, সে অন্তর দ্বারা ইসলামকে গ্রহণ করে না, কিন্তু কোনো কারণে মৌখিকভাবে নিজেকে মুমিন বা মুসলিম বলে প্রকাশ করে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর যুগে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই প্রমুখ প্রসিদ্ধ মুনাফেকদের অবস্থা ছিল। এই মুনাফেকী প্রকৃত পক্ষে নিকৃষ্টতর কুফরী। এই মুনাফেকদের সম্পর্কেই কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ নিশ্চয়ই মুনাফেকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে নিক্ষিপ্ত হবে। (সূরা নিসা) কিন্তু কতগুলো খারাপ স্বভাব ও মন্দ চরিত্রও এমন রয়েছে, যেগুলোর সাথে ওই মুনাফেকদের বিশেষ সম্পর্ক থাকে এবং আসলে এগুলো তাদেরই অভ্যাস ও চরিত্র। কোনো মুসলমানের মধ্যে এগুলোর ছায়াও না পড়া উচিত। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে কোনো মুসলমানের মধ্যে যদি এমন কোনো অভ্যাস ও স্বভাব পাওয়া যায়, তাহলে মনে করতে হবে যে, তার মধ্যে এ মুনাফেকসুলভ অভ্যাসটি রয়েছে। আর কারো মধ্যে যদি মুনাফেকদের সকল স্বভাবই সমাবেশ ঘটে যায়, তখন মনে করতে হবে যে, চরিত্রের দিক দিয়ে এ লোকটি পূর্ণ মুনাফেক। সারকথা, একটি মুনাফেকী তো ঈমান আকীদার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, যা নিকৃষ্টতর কুফরী। কিন্তু এ ছাড়াও কোনো মুনষের চরিত্র মুনাফেকদের চরিত্রের ন্যায় হয়ে যাওয়াও এক ধরনের মুনাফেকী। তবে সেটা আকীদাগত মুনাফেকী নয় বরং চরিত্র ও কর্মের মুনাফেকী। একজন মুসলমানের জন্য যেভাবে কুফর, শিরক ও আকীদাগত মুনাফেকী থেকে বেঁচে থাকা জরুরী তেমনিভাবে মুনাফেকসূলভ চরিত্র এবং মুনাফেকসুলভ কর্মকাণ্ড থেকেও নিজেকে হেফাজত করা জরুরি।

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুনাফেকী স্বভাবসমূহের মধ্য থেকে চারটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। ১. খেয়ানত, ২. মিথ্যা, ৩. প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা এবং ৪. গালিগালাজ ও কটু কথা বলা। তিনি এও বলে দিয়েছেন যে, যার মধ্যে এই স্বভাবসমূহের একটিও পাওয়া যাবে, মনে করতে হবে যে, তার মধ্যে একটি মুনাফেকী স্বভাব রয়েছে। আর যার মধ্যে এই চারটিরই সমাবেশ ঘটবে সে নিজের চরিত্র পরিচয়ে নির্ভেজাল মুনাফেক হিসেবে পরিচিত হবে।

মনে ওয়াসওয়াসা আসা ঈমানের পরিপন্থী নয় এবং এর জন্য শাস্তিও হবে না:

عن ابى هريرة قال قال رسول الله ﷺ ان الله تجاوزلى عن امتى ما وسوست به صدورها مالم تعمل به او تتكلم

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের অন্তরে আবর্তিত কুচিন্তা ও ওয়াসওয়াসার বিষয়টি মাফ করে দিয়েছেন– যে পর্যন্ত এগুলো কার্যে পরিণত অথবা মুখে উচ্চারণ না করা হয়। (বুখারী ২৫২৮, মুসলিম ১২৭, আবু দাউদ ২২০৯)

ব্যাখ্যা : মানুষের মনে অনেক সময় খুবই খারাপ চিন্তা ও ভাব জাগ্রত হয় এবং কোনো কোনো সময় অবিশ্বাসী ও নাস্তিকসুলভ প্রশ্ন এবং আপত্তি মানুষের মস্তিষ্ককে অস্থির করে ফেলে। এ হাদীসে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, এসব কুচিন্তা ও ওয়াসওয়াসা যে পর্যন্ত ওয়াসওয়াসার পর্যায়েই থাকে সে পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে এর উপর কোনো শাস্তি দেওয়া হবে না। হ্যাঁ যখন এসব কুচিন্তা ওয়াসওয়াসার পর্যায় অতিক্রম করে কর্ম ও কথায় পরিণত হয়ে যাবে, তখন এগুলোর ওপর অবশ্যই শাস্তি দেওয়া হবে।

عن ابن عباس ان النبى ﷺ جاء ه رجل فقال انى احدث نفسى بالشئ لان اكون حممة احب الى من ان اتكلم به قال الحمد لله الذى رد امره الى الوسوسة۔

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খেদমতে এসে আরয করল, আমার মনে কখনো কখনো এমন কুচিন্তা আসে যে, এগুলো মুখে আনার চেয়ে আগুনে পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া আমার নিকট অধিক প্রিয়। তিনি বললেন, আল্লাহর শুকরিয়া, যিনি বিষয়টিকে ওয়াসওয়াসা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। (তাবরানী ১০৮৩৮, নাসাঈ ৬৬৮, মুসনাদে আহমদ ৩১৬১ ইত্যাদি)

মর্ম এই যে, এটা দুঃখিত ও চিন্তিত হওয়ার কোনো বিষয় নয়, বরং আল্লাহর শোকর আদায় করো যে, তাঁর অপার অনুগ্রহ তোমার অন্তরকে এসব কুচিন্তা ও মন্দভাব বাস্তবে পরিণত করা থেকে রক্ষা করেছে এবং এই ব্যাপারটাকে ওয়াসওয়াসার পর্যায় থেকে সামনে অগ্রসর হতে দেয়নি।

দরসে ফিক্বহ

শরীয়তের আলোকে রাওজা পাকের যিয়ারত

মুফতী শাহেদ রহমানী

পবিত্র হজ ও উমরা পালনার্থে মক্কা শরীফে গমণকারীদের জন্য হজ ও উমরাসংক্রান্ত কাজসমূহ সম্পন্ন করলেই হজ ও উমরা আদায় হয়ে যায়। অতঃপর মদীনা শরীফ গমন করে রাওজা পাকের যিয়ারত করতে হয় পবিত্র এই সফরের পরিপূর্ণতা লাভের জন্য। কেউ যদি উমরা ও হজ পালন শেষে রাওজা পাকের যিয়ারত না করে তার হজ ও উমরা আদায় হয়ে গেলেও অসম্পূর্ণ থেকে যাবে তার সফরটি।

ইদানীং তথাকথিত 'হাদীস পার্টি'র লোকেরা বলে বেড়ায় রাওজা পাকের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফ গমন করা বিদ'আত! তারা বলে, মদীনা শরীফ গমন করতে হবে মসজিদে নববীতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে। অথচ মক্কা শরীফের মসজিদে হারামে নামায পড়ার ফজীলত মসজিদে নববীর চেয়ে দ্বিগুণ। তাই যারা বলে মদীনা শরীফে গমনের উদ্দেশ্য হবে মসজিদে নববীতে নামায পড়া, তারা দ্বিগুণ ফজীলত বাদ দিয়ে স্বল্প ফজীলতের দিকেই আহ্বান করে, যা নেহায়াত বোকামি ছাড়া কিছু নয়।

মূলত, মদীনা শরীফ গমনের একমাত্র উদ্দেশ্য হতে হবে রাওজা পাকের যিয়ারত। হাদীস ও ফিক্বহ গ্রন্থের আলোকে এই-সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিয়ে আজকের দরসে ফিকহ।

মদীনা শরীফে গমন নিছক কোনো ভ্রমণ নয়। বরং তা একটি মোবারক সফর এবং গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতও। আর তা হতে হবে রাওজা পাকের যিয়ারতের নিয়তেই। মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা নববী (রহ.) লেখেন–

اذا انصرف الحجاج والمعتمرون من مكة فليتوجهوا الى مدينة رسول الله ﷺ لزيارة تربته ﷺ فانها اهم القربات وانجح المساعى- (الايضاح ٤٤٧)

হজ ও উমরাকারীগণ মক্কা শরীফ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে রাওজা পাকের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফের সফর করবে। কেননা এটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং সফলতার সর্বোত্তম প্রচেষ্টা।

হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে–

من زار قبرى وجبت له شفاعتى (دار قطنى ٢/٢٧٨)

যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করল তার জন্য আমার সুপারিশ অবধারিত।

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী (রহ.) লেখেন–

ثم يشمل زيارته ﷺ حيا وميتا ويشمل للذكر والانثى فمن قرب او بعد فيستدل به على فضيلة شد الرحال لذالك وندب السفر للزيارة اذ للوسائل حكم المقاصد (حاشية على الايضاح ٤٨١)

উপরোল্লিখিত হাদীসটিতে নবী করীম (সা.)-এর যিয়ারত জীবদ্দশায় ও পরবর্তী জীবনে উভয়টিকেই বোঝানো হয়েছে। তদ্রূপ যিয়ারতকারী কাছের হোক বা দূরবর্তী, পুরুষ হোক বা মহিলা সকলকেই বোঝানো হয়েছে।

এই হাদীসটি রাওজা পাকের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফের সফর মুস্তাহাব ও ফজীলতপূর্ণ হওয়ার প্রমাণ বহন করে। কেননা উপকরণে উদ্দেশ্য সাধনের মতোই সওয়াব পাওয়া যায়।

প্রসিদ্ধ ফতওয়া গ্রন্থ ফাতাওয়া আলমগীরীতে উল্লেখ রয়েছে–

قال مشائخنا رحمهم الله تعالى انها افضل المندوبات وفى شرح المختار انها قربية من الوجوب لمن له سعة والحج ان كان فرضا فالاحسن ان يبدأ به ثم يثنى بالزيارة وان كان نفلا كان بالخيار فاذا نوى زيارة القبر فلينو معه زيارة مسجد رسول الله ﷺ (٢٩١/١)

আমাদের শীর্ষ উলামাদের মত হলো, রাওজা পাকের যিয়ারত সর্বোত্তম মুস্তাহাবসমূহের একটি। শরহে মুখতার নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, যার সামর্থ্য আছে তার জন্য রাওজা পাকের যিয়ারত ওয়াজিব পর্যায়ের। হাজীগণ ফরজ হজ হলে প্রথমে হজ করবে পরে যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফ যাবে। নফল হজ হলে উভয়টির সুযোগ রয়েছে। রাওজা পাকের যিয়ারতের নিয়তের সাথে মসজিদে নববীর যিয়ারত অথবা নামায পড়ার নিয়্যাতও করতে পারবে।

হানফী মাযহাবের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ দুররুল মুখতারে উল্লেখ আছে–

زيارة قبره ﷺ مندوبة باجماع

(৩ পৃষ্ঠার পর)

তারপর ধীরে ধীরে তিনি দৃষ্টি নিচের দিকে নামিয়ে দেন এবং নিজের ডান দিকে যমীনের দিকে তাকাতে থাকেন। ওই দিকে তিনি মুখমণ্ডলও ঘুরিয়ে দেন। আর এমনভাবে মাথা হেলাতে থাকেন যে, যেন কারো নিকট থেকে কিছু বুঝতে রয়েছেন এবং কেউ তাঁকে কিছু বলতে রয়েছেন। কিছুক্ষণ পর্যন্ত এই অবস্থাই থাকে। তারপর তিনি স্বীয় দৃষ্টি উঁচু করতে শুরু করেন, এমন কি আকাশ পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টি পৌঁছে যায়। তারপর তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় চলে আসেন এবং পূর্বের বসার অবস্থায় হযরত উসমানের (রা.) দিকে মুখ করেন। হযরত উসমান (রা.) সবকিছুই দেখতে ছিলেন। তিনি আর ধৈর্য ধরতে পারলেন না। জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার পাশে বেশ কয়েকবার আমার বসার সুযোগ ঘটেছে। কিন্তু আজকের মত কোনো দৃশ্য তো কখনও দেখিনি। রাসূলুল্লাহ (সা.) তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করেন কী দেখেছো? তিনি উত্তরে বলেন, দেখি যে আপনি দৃষ্টি আকাশের দিকে উত্তোলন করলেন এবং পরে নিচের দিকে নামিয়ে দিলেন। এরপর ডান দিকে ঘুরে গিয়ে ওই দিকেই তাকাতে লাগলেন, এবং আমাকে ছেড়ে দিলেন। তারপর আপনি মাথাকে এমনভাবে নাড়াতে থাকলেন যে, যেন কেউ আপনাকে কিছু বলছে এবং আপনি কান লাগিয়ে তা শুনছেন। তিনি বললেন, তা হলে তুমি সবকিছুই দেখেছো? তিনি জবাবে বলেন জি হ্যাঁ। আমি সব কিছুই দেখেছি। রাসূলুল্লাহ (সা.) তখন ইরশাদ করেন, আমার কাছে আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত ফেরেশতা ওয়াহী নিয়ে এসেছিলেন, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত? তিনি উত্তর দিলেন হ্যাঁ আল্লাহ কর্তৃকই প্রেরিত। তিনি প্রশ্ন করলেন তিনি আপনাকে কী বললেন? তিনি জবাব দিলেন, তিনি আমাকে ان الله يامر بالعدل والاحسان এই আয়াতটি পড়ে শুনালেন।" হযরত উসমান ইবনে মাযউন (রা.) বলেন, তৎক্ষণাৎ আমার অন্তরে ঈমান সুদৃঢ় হয়ে যায় এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মহব্বত আমার অন্তরে স্থান করে নেয়। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

المسلمين- (٤/٦٣)

সকল মুসলমানের ঐক্যমতে রাওজা পাকের যিয়ারত মুস্তাহাব।

আল্লামা সমহূদী (রহ.) বলেন–

وقد ثبت خروج النبى ﷺ وحينئذ فقبره ﷺ اولى قد انعقد الاجماع على ذلك لاطباق السلف والخلف عليه (وفاء الوفاء ٤/١٨٨)

উহুদের শহীদগণের কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে নবী করীম (সা.) তাশরীফ নিয়েছেন এমন প্রমাণ রয়েছে। (এতে প্রমাণিত হয় কবর যিয়ারতের জন্য বের হওয়া জায়েয আছে) দুনিয়ার সকল কবরের মধ্যে সর্বোত্তম ও সবচেয়ে বেশি যিয়ারতোপযুক্ত হলো রাওজায়ে রাসূল (সা.)। (তাই এতদোদ্দেশ্যে সফর করাও উত্তম) এছাড়া পূর্বাপর সকল উলামায়ে কেরামের এই বিষয়ে ঐক্যমত রয়েছে।

বিখ্যাত ফকীহ আল্লামা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) বলেন–

جب مدینہ کا عزم ہوتو بہتر یوں ہے کہ نیت زیارت قبر مطہر کی کر کے جاوے (تالیفات رشیدیہ ٦٤٨)

মদীনা শরীফ গমনেচ্ছুকদের উদ্দেশ্য রাওজা পাকের যিয়ারত হওয়াই উত্তম।

শায়খুল ইসলাম আল্লামা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) বলেন–

ہمارے اکابر زیارت مطہر کیلئے سفر کرنے کو نہ صرف جائز بلکہ افضل المستحبات اور قریب واجب قرار دیتے ہیں، بلکہ محض زیارت کیلئے سفر کرنا جس میں اور کوئی دوسری قربت منوی ولحوظ نہ ہو افضل اور اعلی قرار دیتے ہیں۔ (نقش حیات ١٦١)

আমাদের আকবিরগণ রাওজা পাকের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করাকে শুধু জায়েযই বলেননি বরং এটিকে সর্বোত্তম মুস্তাহাব কাজ বলে উল্লেখ করেছেন। শুধু তা-ই নয়, মদীনা শরীফের সফরে শুধুমাত্র রাওজা পাকের যিয়ারত ছাড়া অন্য কোনো ভালো কাজের নিয়্যাত না করাকেই উত্তম বলেছেন।

হাদীসের প্রখ্যাত ব্যাখ্যাকার আল্লামা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (রহ.) বলেন–

عندنا وعند مشائخنا زيارة قبر سيد المرسلين من اعظم القربات واهم المثوبات وانجح لنيل الدرجات بل قريبة من الواجبات- (المهند على المفند ٣٤)

আমাদের ও আমাদের পূর্বসূরিদের মতে রাওজায়ে পাকের যিয়ারত সর্বোত্তম নেকী ও সর্বাধিক সওয়াবের কাজই নয় বরং তা ওয়াজিবেরই নিকটবর্তী।

উপরে উল্লেখিত হাদীস, হাদীসের ব্যাখ্যা, মুহাদ্দিসীন ও ফোকাহাদের বক্তব্য দ্বারা একথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, মুসলমানদের জন্য মদীনা শরীফের সফর হবে একমাত্র রাওজায়ে পাকের যিয়ারতের উদ্দেশ্যেই। যদি কেউ বলে রাওজায়ে পাকের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে না, তা চূড়ান্ত ভ্রষ্টতা ও ভ্রান্তি এবং তা নবীজি (সা.)-এর শানে বেয়াদবীও বটে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে রাওজায়ে পাকের যিয়ারত বার বার নসীব করুন। আমীন।

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক্ব হক্কী হারদূয়ী (রহ.)-এর

অমূল্য বাণী

নারীদের দ্বীনি ফিকিরের উপকার : সন্তানের দ্বীনি শিক্ষায় পারদর্শী ও ফক্বীহ হওয়ার ক্ষেত্রে মায়েদের দ্বীনি ফিকির খুবই প্রয়োজন। বর্তমানে সে দিকটা অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। আগেকার যুগে আমাদের মা-বোনরা এর প্রতি খুবই ধাবিত ছিলেন। তাঁরা সন্তান-সন্ততির দ্বীনি শিক্ষার প্রতি খুবই গুরুত্ব দিতেন। আপনাদের একটি ঘটনা শোনাই। তাতে আপনারা অনুমান করতে পারবেন সন্তানদের দ্বীনি শিক্ষায় পারদর্শী বানানোর পেছনে মা-বোনদের কত ত্যাগ ও অবদান ছিল।

ইমাম বুখারী সারা দুনিয়ায় একজন প্রসিদ্ধ হাদীস বিশারদ। ইমাম বুখারী (রহ.) কার মেহনতের ফসল? ছোটকালেই তাঁর পিতা ইন্তিকাল করেন। মা এবং বোন তাঁর শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করেন। তাঁরা যুগের বড় বড় মুহাদ্দিসগণের কাছে তাঁকে নিয়ে যেতেন। তাঁদের বৈঠকে বসার ব্যবস্থা করতেন। তাঁদের কাছ থেকে দু'আ নিতেন। তাঁদের সাহচর্যে বসাতেন। তাঁদের এই মেহনত এবং ধর্মীয় অনুরাগের ফসল হিসেবে ইমাম বুখারী দুনিয়া সেরা হাদীছ বিশারদ হয়েছেন। তিনি কিতাব লেখেছেন 'বুখারী শরীফ'। সারা দুনিয়ায় এখন বুখারী শরীফ আছে। যেখানে যাবেন বুখারী শরীফ পাবেন। এটি কার লালন, পালন এবং ধর্মীয় অনুরাগের ফসল?

ইমাম ইবনুল জওযী (রহ.) দুনিয়া খ্যাত একজন মুহাদ্দিস। তিন বছর বয়সে তাঁর মাতা ইন্তিকাল করেন। ফুফির তত্ত্বাবধানে তিনি তারবিয়াত পান। তাঁর ফুফি যদি অবগত হতেন অমুক স্থানে দ্বীনি সভা হচ্ছে, অমুক স্থানে কোনো বড় আলেমের আগমন ঘটেছে, তখন ভাতিজাকে সেখানে নিয়ে যেতেন, ওয়াজ-নসীহত শোনাতেন, বড় আলেমের কাছ থেকে দু'আ নিতেন। সভায় অংশ নেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এরূপ তারবিয়াতের ফলশ্রুতিতে স্বয়ং ইবনুল জওযী ১০ বছর বয়সে নিজে ওয়াজ করার যোগ্য হয়ে গেলেন। এই বয়সেই প্রখ্যাত বক্তা ও ওয়ায়েজ হয়ে যান। ইতিহাস গ্রন্থে পাওয়া যায় তাঁর ওয়াজে এত আসর ও প্রভাব ছিল শ্রোতাগণ ডুকরে কাঁদতেন, অনিচ্ছাকৃত চিল্লায়ে উঠতেন। আল্লাহর কী কারিশমা তাঁর ওয়াজ শুনে বিশ হাজারেরও বেশি ঈসায়ী ও ইহুদী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর বয়ান শুনে শুনে লাখের উপর মুসলমান সুন্নাতের অনুসারী হয়েছেন। এটি কিসের অবদান। কার তারবিয়াতে এসব হয়েছে। তাঁর ফুফিরই মেহনতের ফসল এটি। আমাদের মা-বোনদের দ্বীনি অনুপ্রেরণা ও অনুরাগের কী অবস্থা? আল্লাহু আকবর! এরূপ কত ঘটনাই আছে। এটি একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়। এই দিকটার প্রতি মনোনিবেশ করার জন্যই কয়েকটা ঘটনা বললাম।

পড়ালেখার জন্য বোনের সহানুভূতি : এক ছাত্র কোনো মাদরাসায় পড়ত। স্কুল-কলেজে যেমন পাঠ্যক্রম থাকে, সেরূপ মাদরাসায়ও আছে। উক্ত মাদরাসায় পাঠ্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর তার ইচ্ছা হলো আরো ইলম অর্জন করবে। এর জন্য অন্যত্র যেতে হবে। কিন্তু মনে মনে ভাবল যদি মাতা-পিতাকে বলি তবে অনুমতি নাও দিতে পারেন। তাই সে নিজে নিজে সামান গুটিয়ে নিল। কিন্তু বোন তার বিষয়টি অনুমান করে ফেলল। তার কাছে নিজের স্বত্বাধিকারী কিছু অলংকার ছিল। সে তার অলংকারগুলো ভাইয়ের সামানের ভেতর রেখে দিল। সেখানে একটি চিরকুট লিখে দিল। ভাই! ইলমে দ্বীনের প্রতি তোমার আগ্রহ দেখে আমি সত্যিই খুশি হয়েছি। তুমি ঘরে থেকে পড়ার সময় তোমার অনেক সেবা করার সুযোগ হতো। এখন হয়তো তুমি বাইরে গিয়ে লেখাপড়া করতে চাইছো। এই অলংকারগুলো আমার স্বত্বাধিকারে আছে। আমি তা তোমার জন্য এখানে রাখলাম। তোমার যখন প্রয়োজন পড়ে, তা থেকে খরচ করো। ওই ছাত্র তার গন্তব্যে পৌঁছার পর তার সামানের ভেতর বোনের অলংকার এবং পত্রটি পেয়ে খুবই খুশি হলো এবং গুরুত্বের সাথে লেখাপড়া সম্পন্ন করে বড়মাপের আলেম হলো। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত আলেমে দ্বীনি আল্লামা চাগমীনী (রহ.)। ইলমে হাইয়াত ও ফালসাফার তথা জ্যোতির্বিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব লিখেন। এসব মা-বোনদের ইলমে দ্বীনের প্রতি ভালোবাসা ও অনুরাগেরই ফসল।

মাওয়ায়েযে

হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম)

বসুন্ধরা মারকায, চট্টগ্রামের শুলকবহর মাদরাসাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম) আকদে নিকাহের অনুষ্ঠান এবং হাদীসের দরসে বিবাহের শরয়ী নীতিমালা, সুন্নত তরীকা, সমাজে প্রচলিত রুসুম সম্পর্কে বিস্তারিত বয়ান ও তাকরীর পেশ করেন। তাঁর তাকরীর ও বয়ানগুলোর আলোকে প্রমাণিক এই প্রবন্ধটি সাজানো হয়েছে।

ইসলামী বিয়ে-১১

পত্রিকায় বিজ্ঞাপন

আজকাল পত্রপত্রিকার বিশেষ একটি পাতায় পাত্র-পাত্রীর শারীরিক গঠন, রূপের বিবরণ ও শিক্ষাগত যোগ্যতা বর্ণনার পাশাপাশি লোভনীয় অফারসংবলিত বিবাহের বিজ্ঞপ্তি ছাপানো হয়। এর মধ্যে নির্লজ্জতা এবং প্রতারণা দুটি দিকই রয়েছে। প্রতারণার খবর তো পত্রপত্রিকায়ই ছাপানো হয়। নির্লজ্জতার দিকটিও ভেবে দেখুন। একজন ব্যক্তির বিশেষ করে একজন মেয়ের দৈহিক গঠন ও রূপের বিবরণ দিয়ে লাখো ব্যক্তির সামনে তাকে বিবাহ করার আহ্বান করা তার নারীত্বকে চরমভাবে পদাঘাত করারই শামিল। এছাড়া এটা অরুচিশীলও বটে।

বিবাহের বয়স

কুরআন-হাদীসের আলোকে বোঝা যায়, বিয়ের জুতসই বয়স অর্থাৎ বালেগ হওয়ার পরই বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে দেয়া উত্তম। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح

"তোমরা এতিমদেরকে বিয়ের বয়স পর্যন্ত পরীক্ষা করো।" উক্ত আয়াত দ্বারা স্পষ্ট বুঝে আসে। বিবাহের উপযুক্ত সময় বালেগ হওয়ার পর। অনুরূপ রাসূল (সা.) অভিভাবকদের দায়িত্বের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন-

من ولد له ولد فليحسن اسمه وادبه فاذا بلغ فليزوجه

অর্থাৎ কারো সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে যেন তার একটি সুন্দর নাম রাখে এবং আদব শেখায়। অতঃপর যখন বালেগ হবে তাকে বিয়ে করিয়ে দেবে। (বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান)।

অন্য এক হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন-

فى التوراة مكتوب من بلغت ابنته اثنى عشرة سنة ولم يزوجها فاصابت اثما فانما اثمه عليه۔

অর্থাৎ তাওরাতেও এ বিধান লিখিত রয়েছে যে, যে ব্যক্তির মেয়ে বারো (১২) বৎসর বয়সে উপনীত হলো, অথচ (মেয়ের বিবাহের প্রয়োজন যেকোনোভাবে অনুভব করতে পেরেও) তাকে বিবাহ দিল না, ফলশ্রুতিতে সে কোনো গুনাহে লিপ্ত হলো তাহলে এই গুনাহের ভাগ অভিভাবককেও নিতে হবে। (বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান)

একজন অভিভাবক হিসেবে রাসূল (সা.)-এর আমল সকলের জন্য অনুস্মরণীয় এবং রাহবর হিসেবে গণ্য হবে। অভিভাবক হিসেবে রাসূল (সা.) হযরত ফাতেমা (রা.) এবং হযরত আলী (রা.)-এর মাঝে বিবাহ সম্পন্ন করেন যখন তাদের বয়স যথাক্রমে ষোলো (১৬) ও একুশ (২১)। সুতরাং উল্লিখিত বয়সের মধ্যেই বিবাহ সম্পন্ন করে দেয়া উত্তম এবং নিরাপদও বটে। বিশেষত নৈতিক অবক্ষয়ের এ যুগে। অতএব, 'কুড়িতে বুড়ি নয়, বিশের আগে বিয়ে নয়' এ ধরনের স্লোগান নৈতিকতার কফিনে সর্বশেষ পেরেকটিও ঠুকে দেয়ার শামিল।

বিলম্ব করা :

বিয়ের বয়স হওয়ার পরও বিভিন্ন অজুহাতে কালক্ষেপণ করা কোনো অবস্থাতেই কাম্য নয়। মনে রাখতে হবে, নৈতিক অবক্ষয়রোধে বিবাহের কোনো বিকল্প নেই। তাই তো রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন-

ياعلى ثلاث لا تؤخرها الصلاة اذا اتت والجنازة اذا حضرت والايم اذا وجدت لها كفوا۔

অর্থাৎ হে আলী! তিনটি কাজে বিলম্ব করা উচিত নয়। (১) নামাযের যখন সময় হয়ে যাবে (২) জানাযা যখন উপস্থিত হবে (৩) এবং অবিবাহিত মেয়ের যখন উপযুক্ত পাত্র মিলে যাবে। (তিরমিযী)

হযরত থানভী (রহ.) বলেন-

آج کل رائے یہ ہے کہ شادی جلدی ہونی چاہئے ، کیونکہ اب وہ عفت ودیانت طبیعتوں میں نہیں رہی جو پہلے تھی۔

অর্থাৎ এ যুগের ব্যাপারে মতামত হলো, আগেভাগে বিবাহ হয়ে যাওয়া সমীচীন। কেননা এখনকার যামানায়

আগের মতো মানুষের স্বভাবে পবিত্রতা ও দ্বীনদারী বজায় রাখার মানসিকতা নেই। (ইসলামী শাদী-১২০)

প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার বয়স :

বালেগ হওয়ার কোনো নিদর্শন পাওয়া গেলে ছেলেমেয়েকে বালেগপ্রাপ্ত বয়স্ক ধরা হবে। তবে একটি কথা মনে রাখা অতীব জরুরি যে, কোনো মেয়ে নয় (৯) বছরের পূর্বে আর কোনো ছেলে বারো (১২) বছরের পূর্বে বালেগ হতে পারে না। পনেরো (১৫) বছর অতিক্রম করার পর কেউ না বালেগ থাকে না। (আদ্দুররুল মুখতার ও শামী ৬/১৫৩-১৫৪)

বাল্যবিয়ে :

শরীয়তের দৃষ্টিতে বাল্যবিয়ে অর্থাৎ বালেগ হওয়ার পূর্বেই ছেলেমেয়েকে বিবাহ করিয়ে দেয়া নিষিদ্ধ নয়। তবে এ ধরনের বিবাহের প্রতি উৎসাহিতও করা হয়নি। সুতরাং বাল্যবিয়েকে আইনের মাধ্যমে নয় বরং নিরুৎসাহিত করণের মাধ্যমে রোধ করাই হবে একজন প্রকৃত মুসলমান ও জ্ঞানী ব্যক্তির কাজ। অনুরূপ আইন করে নির্দিষ্ট বয়সের আগে বিবাহকে অবৈধ বলা যেমন শরীয়তবিরোধী, তেমনি নৈতিক অধঃপতনেরও কারণ। এ ধরনের আইন মানুষকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে বাধ্য করে। বিষয়টি অতীব বিবেচনাযোগ্য। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে ১৮ বছরের পূর্বে মেয়েদের বিবাহ আইনত নিষিদ্ধ।

অভিভাবককে না জানিয়ে বিবাহ করা :

শরীয়তের নির্দেশ হলো, অভিভাবকরা যেন ছেলেমেয়ের অনুমতি সাপেক্ষে তাদের বিবাহ সম্পাদন করে। অন্যদিকে ছেলেমেয়েকেও কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছে অভিভাবকদের সম্মতি ছাড়া নিজের বিবাহ নিজেই সম্পন্ন না করতে। বিশেষ করে মেয়েদের বেলায় শরীয়তসম্মত কোনো কারণ ছাড়া এ কাজ করা শরীয়ত এবং সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে চরম নির্লজ্জকর -বেহায়াপনার বহিঃপ্রকাশ। এ ধরনের বিবাহ শরয়ী সাক্ষীর উপস্থিতিতে হলে শুদ্ধ হয়ে যাবে। বাস্তবতা হলো এ ধরনের বৈবাহিক সম্পর্কে বরকত, শান্তি ও স্থায়িত্ব কোনোটাই হয় না। তিরস্কার আর গ্লানি হয় তাদের নিত্যদিনের সঙ্গী। শেষ পরিণাম ডিভোর্স বা ছাড়াছাড়ি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আত্মহত্যার মতো জঘন্য কাজ। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন–

لاتنكحوا النساء الا من الاكفاء ولا يزوجهن الا الاولياء

অর্থাৎ তোমরা মেয়েদেরকে অবশ্যই তাদের কুফু (সমকক্ষ) দেখে বিবাহ দেবে। আর তাদের বিবাহ তাদের অভিভাবকরাই দেবে। (বাইহাকী, দারাকুতনী)

স্মরণীয় বিষয় হলো, উপরোল্লিখিত বিধান শুধুমাত্র বালেগ মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নাবালেগদের বিবাহ অভিভাবক ছাড়া কোনো অবস্থাতেই বৈধ হবে না। (আদ্দুর ও শামী ৩/৫৫)

বর্তমানে 'পালিয়ে বিয়ে'র সংখ্যা যে হারে বেড়ে চলেছে এর জন্য মূলত অন্ধ অভিভাবকত্ব দায়ী। যারা সন্তানদের বিবাহের উপযুক্ত হওয়ার পরও এমনকি ২০, ২৫, ৩০ বৎসর পেরিয়ে গেলেও ছোট মনে করে থাকে। পাশাপাশি অবাধে চলাফেরার খোলামেলা অনুমতি এবং পর্দাহীনতাও অন্যতম কারণ। সুতরাং বিচক্ষণ অভিভাবকত্ব ও লজ্জার দীক্ষা দিলে অবস্থার পরিবর্তন হবেই ইনশাআল্লাহ! রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন–

الحياء لايأتى الا بخير

"লজ্জা কল্যাণকেই বয়ে আনে।" (বুখারী, মুসলিম)

রাসূল (সা.) আরো ইরশাদ করেন -

ان لكل دين خلقا وخلق الاسلام الحياء

"প্রত্যেক ধর্মেরই কোনো না কোনো স্বভাবজাত চরিত্র রয়েছে। আর ইসলামের সেই চরিত্রের নাম হলো লজ্জা।" (মালেক, ইবনে মাজাহ)

তাই তো বলা হয়ে থাকে- اذا فاتك الحياء فافعل ماشئت 'লজ্জা না থাকলে যা ইচ্ছা তাই করো।"

সুতরাং মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো 'লজ্জা' বিশেষ করে মেয়েদের বেলায়। এই লজ্জাই হলো সব ভালোর মূল চাবিকাঠি। কারো মধ্যে যখন লজ্জা নামক জিনিসটি থাকবে না তার থেকে কোনো ভালো আশা করা যায় না।

বাগদান অনুষ্ঠান :

বাগদান বলতে নির্দিষ্ট পাত্রের সঙ্গে কন্যাকে বিবাহ দেয়ার অঙ্গীকার করাকে বোঝানো হয়। অতএব, বাগদানের বাস্তবতা বৈবাহিক সম্পর্কের ওয়াদা অঙ্গীকারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই অঙ্গীকারের জন্য তো অনুষ্ঠান করার প্রয়োজন নেই। অন্য কোনো ক্ষেত্রে তো এমনটি করতে মোটেও দেখা যায় না। তাহলে এখানে কেন? এসব কিছু অনর্থক। খেলাফে সুন্নাত এবং বিভিন্ন কারণে শরীয়ত পরিপন্থী বলেও বিবেচিত হবে। যার অস্তিত্ব শরীয়তে নেই তা পালনে এত গুরুত্বারোপ করাটাই

শরীয়তবিরোধী হওয়ার জন্য যথেষ্ট।
এ অনুষ্ঠানে পাত্রীকে পাত্রের তরফ হতে আংটি পড়ানো হয়। আরে ভাই! আকদের পূর্বে কোনো নারী ছাড়া পাত্রীর হাত স্পর্শ করার অনুমতি কোনো পুরুষের জন্য নেই। পাত্র স্বয়ং নিজে হোক বা তার কোনো নিকটাত্মীয় যেমন, পিতা, দাদা বা অন্য কেউ। হ্যাঁ! তারা মেয়ের মাহরাম হলে ভিন্ন কথা। (শামী ৬/৩৭০)
অনেকে মনে করে এই অনুষ্ঠানের দ্বারা বিয়ের কথাবার্তা পাকাপোক্ত হয়। তাহলে কি যারা এই অনুষ্ঠান করে না তাদের কথা কাঁচা থেকে যায়? আশ্চর্য কথা হলো, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় এ ধরনের পাকা কথার পরও ফল পাকে না। খাওয়া তো দূরের কথা। আবার অনেক অপরিপক্ব কথায়ও ফলন হয় এবং তা ঘরেও আসে। মনে রাখবেন! বেশি পাকলে ঝড়ে যাবে! আসল কথা হলো, যার মধ্যে অঙ্গীকার পূরণের স্বদিচ্ছা আছে তার জন্য অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না। আর ভঙ্গকারীকে শত অনুষ্ঠানেও রুখতে পারবে না। এটাই হলো বাস্তবতা ও অভিজ্ঞতা। এমতাবস্থায় আম-ছালা উভয়টি খোয়া যাবে।

হযরত ফাতেমা (রা.)-এর বাগদান :

সত্যিকারের রাসূল প্রেমিকের জন্য হযরত ফাতেমা (রা.)-এর বিবাহ সর্বোত্তম রাহবর। হযরত ফাতেমা (রা.) কে বিবাহ দেয়ার আগে রাসূল (সা.) বাগদান অনুষ্ঠান, মেহেদি অনুষ্ঠান বা অন্য কোনো ধরনের অনুষ্ঠান করেননি। বাগদান বলতে যদি কিছু করে থাকেন তা ছিল এতটুকু যে, হযরত আলী (রা.) রাসূল (সা.)-এর দরবারে এসে চুপচাপ বসে থাকলেন। লজ্জায় বিবাহের প্রস্তাবও দিতে পারলেন না। তখন রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, তুমি ফাতেমাকে বিবাহ করার প্রস্তাব নিয়ে এসেছ? হযরত আলী (রা.) বললেন, হ্যাঁ! রাসূল (সা.) বলেন, তোমার নিকট মোহর দেয়ার মতো কিছু আছে কি? আলী (রা.) বলেন, না। রাসূল (সা.) বলেন, তোমার লৌহবর্মটি কোথায়? আলী (রা.) বলেন, আমার নিকট আছে। রাসূল (সা.) বলেন, আমি ফাতেমাকে তোমার সাথে বিবাহ দিয়ে দিলাম। যাও মোহরস্বরূপ লৌহবর্মটি তাকে দিয়ে দাও। (দালায়েলুন্নবুওয়াহ হা. ১০৬২)
এই হলো জান্নাতি রমণীদের সর্দার হযরত ফাতেমা (রা.)-এর বাগদান ও বিবাহের ইতিবৃত্ত! দেখুন তো এখানে ঢাকঢোল পিটিয়ে ধুমধামের সহিত অনুষ্ঠান করা ও খানার আয়োজনের কথা আছে কি না? তাহলে সহজ একটি কাজকে শরীয়তবিরোধী এবং নিজেদের জন্য কঠিন করে নেয়ার এতসব আয়োজন এবং বাড়াবাড়ি! এসবের ফল কিন্তু অতিমাত্রায় তিক্ত হয়।

মেহেদি অনুষ্ঠান :

আজকাল মেহেদি লাগানোর অনুষ্ঠান ছেলেমেয়ে উভয় তরফেই করা হয়। অথচ এক সময় তা শুধু মহিলাদের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল। আফসোস! পুরুষের বেশে নারীরা অগ্রগামী হলে ও পুরুষ ও নারীর বেশ ধরতে চায়!! তাই তো দেখা যায়, বর্তমানে পুরুষরাও বিবাহের পূর্বে আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেকে মেহেদি দ্বারা রঙিন করে নেয়। আরো আশ্চর্য হলো, এই অভিশপ্ত কাজটি আরেকটি অভিশপ্ত পন্থায়ই সচরাচর আঞ্জাম দেয়া হয় যে, সাধারণত এ কাজের গুরুদায়িত্ব পাত্রের ভাবি, খালতো বোন, মামাতো বোন, তালতো বোন বা অন্য কোনো মেয়ে বান্ধবীর হাতেই ন্যস্ত হয়। মোটকথা হলো, শয়তানকে খুশি করার এবং আল্লাহকে নারাজ করার যাবতীয় উপকরণ সেখানে বিদ্যমান থাকে। উল্লেখ্য, পুরুষের জন্য শুধুমাত্র দাড়ি ও চুলে মেহেদি ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে। শরীরের অন্য কোনো অঙ্গে ব্যবহার করা নারী সাদৃশ্যতার শামিল। (শামী ৬/৪২২)
রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন,
لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال
"পুরুষ হয়ে নারীর সাদৃশ্যতা গ্রহণকারী এবং নারী হয়ে পুরুষের বেশ ধারণকারীনীর ওপর আল্লাহর অভিশাপ। (বুখারী)
পাত্রীপক্ষের মেহেদি অনুষ্ঠানকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।
১. শহরী মেহেদি অনুষ্ঠান। এখানে গুনাহের সব ধরনের সরঞ্জামই মজুদ রাখা হয়। যেমন–গান, বাদ্য, নৃত্য, নগ্নতা, বেহায়াপনা, ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশা ইত্যাদি। এসব অপসংস্কৃতি থেকে একমাত্র সেসব পরিবারই বেঁচে থাকতে সক্ষম হন আল্লাহ যাদেরকে তৌফিক দিয়েছেন।
২. গ্রাম্য মেহেদি অনুষ্ঠান। একসময় তাদের মধ্যে শহরের ন্যায় অশালীনতা ও বেহায়াপনা না থাকলে ও বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে শহরী ছোঁয়া লেগেছে এটাই ধ্রুব সত্য। তবে মেহেদি তোলার নামে তারা যে কাজটি করে থাকে সেটা হিন্দুদের থেকে সংগৃহীত কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

তাহকীক ও গ্রন্থনায় :
মুফতী নূর মুহাম্মদ

"সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরল পথ

নামাযের ক'টি মাসায়েল : বিভ্রান্তি ও নিরসন-৫

বিতির নামায এক সালামে ৩ রাকআত

মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক্ব

নামাযের ব্যাপারে শরীয়তের মূলনীতি এই যে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাতে মুআক্কাদা ও নফল সব ধরনের নামাযের সর্বনিম্ন রাকাআত হলো : দুই রাকআত। তাই দুই রাকআতের কমে এক রাকআত কোনো নামাযই নেই।

عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :صلاة الليل والنهار مثنى مثنى .

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : রাত ও দিনের নামায দুই দুই রাক'আত। (সুনানে তিরমিযী-হা. নং ৫৯৬, মুআত্তা মালেক- হা. নং ১৩৯, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা-হা. নং ৬৬৮৬-৬৬৮৮)

হ্যাঁ, দুই রাকআতের বেশি তিন বা চার রাকাআত ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাতে মুআক্কাদা, ও নফল নামায আছে। আর বিতির শব্দের অর্থ যেহেতু বেজোড়, আর দুই রাকআতের কমে এক রাকআত কোনো নামায নেই; সুতরাং বিতির নামায তিন রাকআত হওয়া নির্ধারিত হয়ে গেল।

নিম্নে বিতির নামায তিন রাকআত হওয়া সম্পর্কিত হাদীসসমূহ উল্লেখ করা হলো :

عن عبد الله بن عمر قال :قال النبى صلى الله عليه و سلم :صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت.

(১) অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : রাতের নামায দুই রাকআত-দুই রাকআত। সবশেষে যখন তুমি (তাশাহহুদ পড়ে) সালাম ফিরানোর ইচ্ছা করবে, তখন সালাম না ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আরো এক রাকআত মিলিয়ে নেবে, যা তোমার আদায়কৃত দুই রাকআতকে বিতির বা বেজোড় (তথা তিন রাকআত) বানিয়ে দেবে। (বুখারী-হা. ৯৯৩, সহীহ মুসলিম হা. নং ৭৪৯, সুনানে নাসাঈ-হা. নং ১৬৬৬-১৬৭৪, সুনানে আবু দাউদ-হা. নং ১৩২৬, সুনানে তিরমিযী-হা. নং ৪৩৭, শরহে মা'আনিল আসার-১/১৯৭)

أن أبا سلمة بن عبدالرحمن سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان؟ فقالت :ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد فى رمضان ولا فى غيره على إحدى عشرة ركعة يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن و طولهن، ثم يصلى أربعافلا تسأل عن حسنهن و طولهن،ثم يصلى ثلاثا.....

(২) অর্থ : হযরত আবূ সালামা ইবনে আব্দুর রহমান (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি আয়েশা (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলেন, রমাজান মাসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নামায কেমন হতো? আয়েশা (রা.) বললেন : (শুধু রমাজান মাস কেন) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রমাজান মাসে এবং অন্যান্য মাসেও এগারো রাকআতের বেশি পড়তেন না। তিনি প্রথমে চার রাকআত তাহাজ্জুদ পড়তেন, এর দৈর্ঘ্য আর সৌন্দর্য সম্পর্কে কী বলব? এরপর আরো চার রাকআত পড়তেন, এর দৈর্ঘ্য আর সৌন্দর্য বর্ণনাতীত! এরপর তিন রাকআত বিতির নামায পড়তেন। (বুখারী-হা. ১১৪৭, মুসলিম-হা. ৭৩৮, সুনানে নাসাঈ-হা.১৬৯৭, সুনানে আবূদাউদ-হা.১৩৩৫, মুসনাদে আহমাদ-হা. ২৪০৭৩)

عن ابن عباس قال:كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل ثمان ركعات ويوتر بثلاث و يصلى ركعتين قبل صلاة الفجر .

(৩) অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাতে আট রাকআত তাহাজ্জুদ পড়তেন এবং তিন রাকআত বিতির পড়তেন, আর ফজরের নামাযের পূর্বে দুই রাকআত সুন্নাত পড়তেন। (সুনানে নাসাঈ-হা. নং ১৭০৭)

عن عامرالشعبى قال :سألت ابن عباس وابن عمر :كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل؟ فقالا :ثلاث عشرة ركعة :ثمان و يوتر بثلاث و ركعتين بعد الفجر.

(৪) অর্থ: হযরত আমের ইবনে শুরাহবীল শা'বী (রহ.) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রাতের নামায সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) কে জিজ্ঞাসা করেছি, তারা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তেরো রাকআত নামায পড়তেন, আট রাকআত তাহাজ্জুদ ও তিন রাকআত বিতির এবং সুবহে সাদিক হওয়ার পর দুই রাকআত সুন্নাত । (তাহাবী- ১/১৯৭)

(৫) বিতির নামাযের তিন রাকআতে সূরা ফাতিহার পর নির্দিষ্ট তিন সূরা মিলিয়ে পড়ার হাদীস যে সকল সাহাবায়ে কেরাম (রা.) বর্ণনা করেছেন,

তাদের নাম হাওয়ালাসহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১/ হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)। (সুনানে তিরমিযী-হা. নং ৪৬৩, মুসনাদে আহমাদ-৬/২২৭, মুসতাদরাকে হাকেম-হা. নং ১১৪৪)

২/ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রা.)। (সুনানে দারেমী-১৫৯৭, সুনানে নাসাঈ-হা. ১৭০২, সুনানে তিরমিযী-হা. ৪৬২, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা-৬৯৪৯-৫১,)

৩/ হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবযা (রা.)। (সুনানে নাসাঈ-হা. নং ১৭৩১, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা-হা. নং ৬৯৪৩-৪৪, মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক-২/৩৩, শরহু মা'আনিল আছার তাহাবী-১/১৪৩)

৪/ হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (রা.)। (মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক-৩/৩৪, শরহু মা'আনিল আছার তাহাবী-১/২০৩)

৫/ হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)। (নাসাঈ-হা. নং ১৭২৯-৩০, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা-হা. নং ৬৯৬০, সুনানে আবু দাউদ-হা. নং ১৪২৩)

৬/ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.)। (শরহু মা'আনিল আছার তাহাবী-১/১৪২, মাজমাউয্ যাওয়াইদ-৪/২৪১)

৭/ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)। (মাজমাউয্ যাওয়াইদ-৪/২৪১, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা-হা. নং ৬৯৪৭)

৮/ হযরত নু'মান ইবনে বাশীর (রা.)। (মাজমাউয্ যাওয়াইদ-৪/২৪১)

৯/ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)। (মাজমাউয্যাওয়াইদ-৪/২৪১)

১০/ হযরত আবূ হুরাইরা (রা.)। (মাজমাউয্যাওয়াইদ-৪/২৪১)

১১/ হযরত আবূ খাইছামাহ (রা.) তার পিতা হযরত মু'আবিয়া ইবনে খাদিজ (রা.) থেকে বর্ণিত।

১২/ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবূ আওফা (রা.)। (মাজমাউয্ যাওয়াইদ-৪/২৪১)

এ সকল হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে বিতির নামায তিন রাকআত, এক রাকআত নয়।

عن عبد الله بن أبى قيس قال :قلت لعائشة رضـ :بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ قالت :كان يوتر بأربع وثلاث و ست وثلاث وثمان وثلاث و عشروثلاث ولم يكن يو تر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة .

(৬) অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবী কাইস (রহ.) বলেন : আমি হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিতির কত রাকআত পড়তেন? তিনি বললেন : চার এবং তিন, ছয় এবং তিন, আট এবং তিন, দশ এবং তিন। তিনি বিতিরে (তাহাজ্জুদসহ) সাত রাকআতের কম এবং তেরো রাকআতের অধিক পড়তেন না। (সুনানে আবূ দাউদ-হা. ১৩৬২, তাহাবী-১/১৩৯, মুসনাদে আহমাদ- হা. ২৫১৫৯)

এই হাদীস দ্বারা বোঝা গেল যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাহাজ্জুদ নামায কখনও চার রাকআত, কখনও ছয় রাকআত, কখনও আট রাকআত, কখনও দশ রাকআত পড়তেন।

কিন্তু মূল বিতিরের নামায সর্বদা তিন রাকআতই পড়তেন।

عن أبى سلمة أن النبى صلى ا لله عليه وسلم كان يوتر بثلاث .

(৭) অর্থ : হযরত আবু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিন রাকআত বিতিরের নামায পড়তেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা-হা. নং ৬৯১৩)

عن عمر بن الخطاب :أنه قال :ما أحب أنى تركت الوتر بثلاث و إن لى حمرالنعم .

(৮) অর্থ : হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেন : যদি আমাকে তিন রাকআত বিতির পরিত্যাগের জন্য লাল উটনীসমূহও প্রদান করা হয়, তবুও আমি তিন রাকআত বিতিরের নামায পরিত্যাগ করা পছন্দ করব না। (মুআত্তায়ে মুহাম্মাদ-হা. নং ২৬০, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা-হা. নং ৬৯৩৩)

এ সকল হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে বোঝা যাচেছ যে বিতিরের নামায তিন রাকআত, এক রাকআত নয়।

তিন রাকআত বিতিরের নামায দুই বৈঠকে ও এক সালামে পড়া জরুরি

حدثنا سعيد.....عن سعد بن هشام أن عائشة حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم فى ركعتى الوتر .

১/ অর্থ : হযরত সা'দ ইবনে হিশাম (রহ.) বলেন : হযরত আয়েশা (রা.) তাকে বলেছেন যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিতিরের দুই রাকআতের পর সালাম ফিরাতেন না। (সুনানে নাসাঈ-হা. ১৬৯৮ মুআত্তায়ে মুহাম্মাদ হা. নং ২৬৬, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা-হা. নং ৬৯১২)

حدثنا سعيد بن أبى عروبة .....عن سعد بن هشام عن عائشة قالت :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسلم فى الركعتين الأوليين من الوتر .

২/ উক্ত সনদে হাদীসটি এভাবেও বর্ণিত আছে যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিতিরের নামাযের প্রথম দুই রাকআতের পর সালাম ফিরাতেন না। (মুসতাদরাক আলাস্ সহীহাইন-হা. ১১৩৯)

عن أبى إسحاق قال :كان أصحاب على و أصحاب عبد الله لايسلمون فى ركعتى الوتر.

৩/ অর্থ : হযরত আবু ইসহাক (রহ.)

থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আলী (রা.)-এর শাগরিদগণ ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর শাগরিদগণ বিতিরের নামাযের দুই রাকআতের পর সালাম ফেরাতেন না। সালাম ফিরাতেন সবশেষে তৃতীয় রাকআতে। যদি দ্বিতীয় রাকআতের শেষে বৈঠক করার নিয়ম না থাকত, তাহলে সালাম ফিরানোর বা না ফিরানোর কোনো প্রসঙ্গই আসত না। কেননা, সালাম তো বসেই ফিরানো হয়ে থাকে।

حدثنا أبان.....عن سعد بن هشام عن عائشة قالت :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث، لايسلم إلا فى أخرهن وهذا وتر امير المؤمنين عمر بن الخطابؓ و عنه أخذه أهل المدينة .

৪/ অর্থ : হযরত সা'দ ইবনে হিশাম (রহ.) থেকে বর্ণিত, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিতির নামায তিন রাকআত পড়তেন এবং শুধু শেষ রাকআতে সালাম ফিরাতেন। আর এটিই আমীরুল মুমিমীন উমর (রা.)-এর বিতিরের নামাযের পদ্ধতি এবং তাঁরই সূত্রে মদীনাবাসী এই নিয়ম গ্রহণ করেছেন। (মুসতাদরাকে হাকীম-হা. নং ১১৪০)

عن أنس أنه أوتربثلاث، لم يسلم إلا فى أخرهن .

৫) অর্থ : হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি তিন রাকআত বিতিরের নামায পড়েছেন এবং শুধু শেষ রাকআতে সালাম ফিরিয়েছেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা-হা. নং ৬৯১০)

عن أبى الزناد قال :أثبت عمر بن عبدالعزيزالوتر بالمدينة بقول الفقهاء ثلاثا لايسلم إلا فى أخرهن.

৬) অর্থ : হযরত আবুয্ যিনাদ (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : খলীফা উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.) মদীনায় ফুকাহায়ে কেরামের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিতিরের নামায তিন রাকআত নির্ধারণ করেছেন এভাবে যে, এই তিন রাকআতের শুধু শেষ রাকআতে সালাম ফিরাতে হবে। (শরহু মা'আনিল আছার তাহাবী-১/২০৭)

এই তিনটি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), হযরত আনাস (রা.) ও উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) তারই সূত্রে মদীনাবাসীগণ সর্বদা তিন রাকআত বিতিরের নামাযের শুধু শেষ রাকআতেই সালাম ফেরাতেন এবং খলীফা উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.) সাতজন বিজ্ঞ ফকীহের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মদীনায় উপরোক্ত পদ্ধতিতে বিতিরের নামায আদায় করার ফরমান জারি করেছেন।

عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العشاء دخل المنزل ثم صلى ركعتين، ثم صلى بعدهما ركعتين أطول منهما، ثم أوتر بثلاث لايفصل فيهن .....

৭) হযরত সা'দ ইবনে হিশাম (রহ.) থেকে বর্ণিত, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইশার ফরয নামায আদায় করে ঘরে আসতেন অতঃপর দুই রাকআত নামায পড়তেন। অতঃপর আরো দুই রাকআত পড়তেন, যা পূর্বের দুই রাকআত নামাযের চেয়ে দীর্ঘ হতো। অতঃপর তিন রাকআত বিতিরের নামায পড়তেন, যার মাঝখানে সালাম দ্বারা আলাদা করতেন না। (মুসনাদে আহমাদ-হা. নং ২৫২২৩)

عن عمر بن الخطابؓ أنه أوتر بثلاث ركعات لم يفصل بينهن بسلام

৮) হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি তিন রাকআত বিতিরের নামায পড়েছেন এবং এই তিন রাকআতের মাঝে কোনো সালাম দ্বারা পৃথকীকরণ করেননি। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা- হা. নং ৬৯০১)

عن ابن عمرؓ قال :صلاة المغرب وتر صلاة النهار.

৯) আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : মাগরিবের নামায দিনের বিতির (বেজোড়)। (মুআত্তায়ে মুহাম্মাদ হা. ২৪৯, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা-হা ৬৭৭৮)

উপরোক্ত হাদীসগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিতিরের নামায তিন রাকআত দুই বৈঠকে ও এক সালামে পড়তে হবে। এটিই রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আমল এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর আমল। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে এক রাকআত বিতির পড়া বা তিন রাকআত বিতির দুই সালামে পড়া সহীহভাবে প্রমাণিত নেই। হ্যাঁ, ২/১জন সাহাবী থেকে এরূপ বিতির পড়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অকাট্য আমলের মুকাবিলায় ২/১ জন সাহাবীর আমল গ্রহণযোগ্য নয়।

এ কারণেই হাফেয ইবনুসসালাহ্ (রহ.) বলেছেন : বিতিরের বর্ণনা অধিক হওয়া সত্ত্বেও আমরা কোনো বর্ণনায় এ কথার প্রমাণ পাইনি যে, নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শুধু এক রাকআত পড়ে বিতির আদায় করেছেন। (ফাতহুল বারী- ২/১৫)

খানেকাহে এমদাদিয়া
আশরাফিয়া আবরারিয়ার
বার্ষিক ইসলাহী ইজতিমা
৯,১০ জানুয়ারী ২০১৪ইং
বৃহস্পতি ও শুক্রবার
স্থান: জামে মসজিদ, মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
বসুন্ধরা, ঢাকা।

নবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান

আখেরি নবী হজরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কেয়ামতকাল পর্যন্ত তাঁর উম্মতের জন্য চলার পথ নির্দেশ করে গেছেন। কালের বিবর্তনে যেসব বৈরী সময় উপস্থিত হবে সেগুলোর স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত করার উদ্দেশ্যেও তিনি এমন কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, যেগুলো একটু মনোযোগসহকারে পাঠ করলে মনে হবে যেন প্রতিটি ঘটনাই আগাগোড়া স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে উম্মতকে সে সম্পর্কে সতর্ক করে গেছেন। হাদীস শরীফের কিতাবাদিতে সতর্কবাণীমূলক এ অধ্যায়টিকে 'ফেতান' নামে অভিহিত করা হয়। 'ফেতান' ফেতনাতুন শব্দের বহুবচন। আভিধানিক অর্থ, স্বর্ণ আগুনে জ্বালিয়ে তার ভালোমন্দ পরীক্ষা করা। যেহেতু নানা ধরনের বৈরী পরিস্থিতির মধ্যে মানুষের ঈমান এবং আমলের পরীক্ষা হয়ে যায়, সে কারণে সব ধরনের বৈরী পরিস্থিতিকেই ফেতনা বলা হয়ে থাকে। মন্দ ধরনের কোনো আমল যখন সে জমানার একটি ফ্যাশনে পরিণত হয়ে যায় এবং বুঝে, না বুঝে মানুষ তা অনুসরণ করতে শুরু করে তখন সেটিকেও একটি 'ফেতনা' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। কেননা এর দ্বারাও মানুষের ঈমানের পরীক্ষা হয়ে যায়। কারা এ ফেতনার মধ্যে নিজেকে সমর্পিত করে দেয়, আর কারা এ পরিস্থিতি সাহসের সাথে মোকাবিলা করে ঈমানের ওপর দৃঢ়পদ থাকে, সেটা দেখার একটা সুযোগ উপস্থিত হয়। অনুরূপ ইসলামের মূল চেতনাবিরোধী কোনো চিন্তাধারা যখন আকর্ষণীয় যুক্তির আবরণে সুসজ্জিত করে সাধারণ মানুষের সামনে উপস্থাপন করা হয় তখন সেটাও একটা ফেতনা হয়ে দাঁড়ায়। কেননা এর দ্বারা মানুষের পরীক্ষা হয়ে যায় যে সে কি স্থূল যুক্তি এবং বাহ্যিক চাকচিক্যের সামনে পরাজয় স্বীকার করে, না সুষ্ঠু যুক্তি ও চিন্তার দ্বারা এ স্থূল চিন্তাধারার মোকাবিলা করে। নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফেতনার প্রতিটি দিক সম্পর্কে উম্মতকে সতর্ক করেছেন। তৎসঙ্গে এ কথাও সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন, উম্মত যখন এসব ফেতনার সম্মুখীন হবে তখন তার কর্তব্য কী হবে! এ-সম্পর্কিত বর্ণনার ধরন এবং আধিক্য এ কথা প্রমাণ করে যে, নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভবিষ্যতের এসব ফেতনার ব্যাপারে খুব উদ্বিগ্ন ছিলেন। একপর্যায়ে তিনি বলেছিলেন, আমার দু'চোখ দেখতে পাচ্ছে ফেতনা তোমাদের প্রতিটি জনপদেই এমনভাবে পতিত হয়, যেমন করে বৃষ্টির ফোঁটা ঝরতে থাকে। (বোখারি কিতাবুল-ফেতান ৭/৪২৪ হাদীস নং ৭০৬০)।

নবী করিম (সা.) এরশাদ করেছেন, সময় অতি দ্রুত অতিবাহিত হবে। অর্থাৎ খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে এক-একটি বিপ্লবাত্মক ঘটনা ঘটে যাবে। সৎকাজ কমে যাবে। দ্বীন সম্পর্কিত জ্ঞান দ্রুত হ্রাস পাবে। অজ্ঞতা ও মূর্খতা ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়বে। সহীহ শুদ্ধ এলম উঠে যেতে থাকবে। অর্থলিপ্সা, লোভ-লালসা ও কার্পণ্য সাধারণ চরিত্রে পরিণত হয়ে যাবে। সর্বত্র হত্যা ও লুণ্ঠনের ছড়াছড়ি দেখা দেবে। (বোখারী, কিতাবুল-ফেতান, ৭/৪২৪ হাদীস নং ৭০৬১, ৭০৬২, ৭০৬৩, ৭০৬৪)।

* নেশাদ্রব্য মদকে নির্দোষ পানীয়রূপে সাব্যস্ত করা হবে। সুদকে ব্যবসারূপে অভিহিত করে হালাল সাব্যস্ত করার অপচেষ্টা চলবে। ঘুষকে উপঢৌকন বলে হালাল সাব্যস্ত করা হবে। জাকাতকে বাণিজ্যে পরিণত করা হবে। অর্থাৎ একশ্রেণীর লোক জাকাত উসুল করে বিভিন্ন পন্থায় তা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করবে।

মানুষ সন্তানের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে সন্তান জন্মগ্রহণ করাটাকে ঘৃণার চোখে দেখবে। বৃষ্টির দ্বারা জমিন শীতল না হয়ে বরং গরম বেড়ে যাবে। ব্যভিচারের বন্যা বইতে থাকবে। মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদী এবং সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদী বলা হবে। আত্মসাৎকারীকে আমানতদার এবং প্রকৃত আমানতদারকে আত্মসাৎকারী বলা হবে। অনাত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক গভীরতর হবে এবং আত্মীয়-এগানার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে। প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর নেতৃত্ব চলে যাবে দুষ্কৃতকারীদের হাতে। প্রকৃত মুমেন ব্যক্তিকে সমাজ ছোট ছোট ছাগলছানার মতো নিতান্ত স্বল্পমূল্যের মনে করা হবে। মসজিদের মেহরাব কারুকার্যমণ্ডিত হবে, কিন্তু দিল হবে অন্তঃসারশূন্য। সমকামের ব্যাপক প্রচলন হবে। পুরুষ-পুরুষের সাথে এবং নারী-নারীদের কামলীলা চরিতার্থ করবে। বিরাট বিরাট এলাকা নিয়ে মসজিদ নির্মিত হবে এবং সেগুলো সুউচ্চ মিনার দ্বারা সুসজ্জিত করা হবে। জনমানবহীন বিরান এলাকা আবাদ হয়ে যাবে এবং অনেক জনবহুল আবাদি বিরান হয়ে যাবে। সর্বত্র পুলিশি রাজত্ব কায়েম হবে। অন্যের ত্রুটি-বিচ্যুতির পেছনে লেগে থাকা, চোগলখুরি ও অন্যের দোষচর্চা ব্যাপকতর হয়ে যাবে। গানবাদ্য ও প্রকাশ্যে মদ্যপান বেড়ে যাবে।

নিয়মিত নামাজ পড়ার প্রচলন কমে যাবে। আমানতের ব্যাপক খেয়ানত হবে। সুদখোরীর প্রচলন ব্যাপকতর হবে। মিথ্যাচারকে বৈধ জ্ঞান করা হবে। মানুষের জীবনের মূল্য সর্বনিম্ন স্তরে নেমে যাবে। সুউচ্চ ইমারত নির্মিত হতে

থাকবে। দুনিয়ার সামান্য স্বার্থের বিনিময়ে দ্বীন বিক্রয় করে দেয়া হবে। সুবিচার বিলুপ্তপ্রায় হয়ে যাবে। চারদিকে শুধু জুলুম আর অবিচারের রাজত্ব কায়েম হবে। তালাকের ঘটনা ব্যাপক হবে। অপমৃত্যুর হার বেড়ে যাবে। একে অপরের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করবে। ইতর শ্রেণীর লোকদের ব্যাপক অভ্যুত্থান ঘটবে আর ভদ্র-বিনীত লোক খুব অল্পই অবশিষ্ট থাকবে। উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা এমনকি মন্ত্রীরা পর্যন্ত মিথ্যা বলবে। জনগণের সম্পদ হেফাজতকারীরা আত্মসাৎকারী হবে। জাতির প্রতিনিধি স্থানীয় লোকগুলো হবে জালেম। দুশ্চরিত্র লোকেরাও কুরআনের ক্বারীরূপে পরিচিত হবে। জীবজন্তুর চামড়ার তৈরি পোশাকের প্রচলন হবে। ওদের অন্তর পচা লাশের চেয়েও বেশি দুর্গন্ধযুক্ত হবে। শান্তি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কুরআন শরীফ বর্ণাঢ্যভাবে মুদ্রণ করা হবে। সুউচ্চ মিনারসংবলিত সুন্দর সুন্দর মসজিদ নির্মিত হবে। কিন্তু মানুষের দিল উজাড় হয়ে যাবে। কুরআনের আইন বাতিল করে দেয়া হবে। কন্যারা পর্যন্ত মায়েদের সাথে দাসী-বাঁদীর মতো আচরণ করবে। যেসব লোকের পরনের কাপড় জুটত না, ওরা শাসন কর্তৃত্বের মালিক হয়ে বসবে। স্ত্রীলোকেরাও স্বামীর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসায়-বাণিজ্য করবে। পুরুষেরা স্ত্রীলোকের এবং স্ত্রীলোকেরা পুরুষের বেশ ধারণ করে প্রকাশ্যে চলাফেরা করবে। আল্লাহর নাম বাদ দিয়ে অন্যের নামে কছম খাওয়া হবে। মুসলমানেরাও মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে। দ্বীনি এলেম আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে অর্জন না করে অন্য কোনো স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে অর্জন করা হবে। জাতীয় কোষাগার ক্ষমতাসীনদের ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত হবে। আমানতকে লুটের মাল জ্ঞান করা হবে। জাকাতকে জরিমানা মনে করা হবে। সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট চরিত্রের লোকগুলোই নেতৃত্বের আসন দখল করে ফেলবে। সন্তান পিতার অবাধ্য হয়ে যাবে, মায়ের সাথে নির্মম আচরণ করবে। বন্ধুত্বের মর্যাদা রক্ষা না করে ক্ষতি করার ফিকিরে থাকবে। অধিকাংশ লোক স্ত্রীর একান্ত অনুগত হয়ে জীবন যাপন করবে। (তিরমিযী ৪/৪২৮ হাদীস নং ২২১০, ২২১১, ২২১২, ৪/৪০৭, হাদীস নং ২০৭০, আল মুজামুল কাবীর হাদীস নং ৭৫২, ৬৩১, ১০৫৫৬, মুসনাদে বাযযার হাদীস নং ৩৪০৯, আল মুজামুল আওসাত ৫/২৩১ হাদীস নং ৪৮৬০, আল মুজামুল কাবীর ১৮/৫১)

চরিত্রহীন লোকেরা মসজিদের মধ্যেও বড় গলায় কথা বলবে। পয়সাওয়ালা লোকেরা গায়িকা-নর্তকীদের রক্ষিতা করে রাখবে। গানবাদ্যের সাজসরঞ্জাম যত্নের সাথে সংরক্ষণ করা হবে। প্রকাশ্যে রাস্তায় বসে লোকেরা মদ পান করবে। জুলুম করে গর্ব প্রকাশ করা হবে। কোর্টকাছারির বিচার পর্যন্ত কেনাবেচা হবে। কুরআন তিলাওয়াতকে সঙ্গীতের পর্যায়ে নামিয়ে আনা হবে। আগের জমানার লোকদের সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করা হবে। (তিরমিযী ৪/৪২৮ হাদীস নং ২২১২)

কলমের ব্যবহার (অর্থাৎ লিখিত পঠনসামগ্রী) ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে। প্রকৃত সত্য গোপন করা হবে। লোকেরা মসজিদে আসবে সত্য; কিন্তু দুই রাকআত (নফল) পড়ার তাওফিক হবে না। একটি ছোট শিশুও একজন বৃদ্ধকে শুধু গরিব মনে করে লাঞ্ছিত করবে। এমন দুশ্চরিত্র লোক সৃষ্টি হবে, যারা পরস্পর দেখাসাক্ষাতের সূচনা করবে সালাম দেয়ার পরিবর্তে গালিগালাজের মাধ্যমে। লোকেরা নরম গদিআঁটা বাহনে আরোহণ করে ঠাঁটবাঁটের সাথে মসজিদের দ্বারে এসে অবতরণ করবে। তাদের স্ত্রীলোকেরা পোশাক পরিধান করেও উলঙ্গপ্রায় হয়ে চলাফেরা করবে। ওদের মাথায় কৃশ উটের কুঁজের মতো চুল বাঁধা থাকবে (মুসনাদে আহমদ ১/৪০৮ হাদীস নং ৩৮৭১, আল মুজামুল আওসাত ৬/৩৬২ হাদীস নং ৬৪২৭, মুসলিম ৩/১৬৮০ হাদীস নং ২১২৮, আল মুজামুল কাবীর হাদীস নং ৯৪৯০, মুস্তাদরাকে হাকেম ৪/৪৩৬ হাদীস নং ৮৩৪৬)।

দ্বীনের বিধিবিধান সম্পূর্ণ উল্টে দেয়া হবে। অর্থাৎ হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম করে দেয়া হবে (মুস্তাদরাকে হাকেম ৪/৪৭৩ হাদীস নং ৮৪৫৯)।

মুসলমানরা ইহুদি নাসারাদের চালচলন অনুসরণ করতে থাকবে। (বুখারী ৭/৫০৩ হাদীস নং ৭৩২০)

আমানত রক্ষা করার মতো লোক খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। লোকেরা এরূপ বলাবলি করবে, অমুক জায়গায় একজন আমানতদার লোক বাস করেন। ওই সব লোকের সাহস, উদ্দীপনা এবং কর্মশক্তির তারিফ করা হবে, যাদের অন্তরে সরিষা বরাবরই ঈমান থাকবে না। (বোখারি ৭/৪৩০ হাদীস নং ৭০৮৬)

নিতান্ত অযোগ্য বাজে লোকেরাও জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে রায় দিতে শুরু করবে (তিরমিযী ২২১০)।

হজরত নবী করিম (সা.) ফেতনার জমানা এবং সে জমানায় যেসব ঘটনা ঘটবে সে সম্পর্কিত যেসব ইশারা-ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন সেগুলোর মধ্য থেকে একটা সামান্য অংশই এখানে পরিবেশন করা হলো। ফেতনা সম্পর্কিত সব হাদিস একত্র করা গেলে দেখা যাবে, বর্তমান যুগের ব্যাপক অবক্ষয়গুলো যেন প্রিয় নবীজি এক-এক করে চৌদ্দ শ' বছর আগেই বলে গেছেন। আজকের যুগের সার্বিক অবস্থাদি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, কী চমৎকারভাবেই না এ যুগের যাবতীয় অসভ্যতা, অনাচার ও অবক্ষয়ের চিত্রগুলো সে ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর সাথে মিলে যাচ্ছে।

লেখক : সম্পাদক, মাসিক মদীনা

হাদীসের তাখরীজ : মাহমূদুল হাসান

সীরাতে রাসূল (সা.)-এর আলোকে সমসাময়িক সমস্যার সমাধান

মাওলানা আনওয়ার হুসাইন

বর্তমান যুগে মানুষ বহুরৈখিক সমস্যায় জর্জরিত। তন্মধ্যে অনেক সমস্যা অর্থনৈতিক, আবার অনেকটা রাজনৈতিক ও চারিত্রিক। কিছু সমস্যা ব্যক্তিকেন্দ্রিক আবার কিছু সামাজিক, কিছু সমস্যা জাতীয় আবার কিছু আন্তর্জাতিক। এই সমস্যাসংকুল সময়ে যখন চারিদিকে হতাশা ও হাহাকার, দিশেহারা সমাজ ও জাতি সবার প্রশ্ন সমাধান, আদৌ আছে কি? নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে আধুনিক যুগের সৃষ্ট বহুমুখী সমস্যাবলির সমাধান দুজাহানের নবী রাহমাতুললিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সীরাতে বিদ্যমান। কেননা মহানবীর (সা.) সীরাত এক পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। তাই তো মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন, "যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।" (সূরা আহযাব-২১)

মহানবীর (সা.) এই জীবন বিধানে বর্তমান সময়ের চলমান অস্থিরতার সমাধানও বিদ্যমান। বিজ্ঞানের এই উৎকর্ষতার যুগে যখন মানুষ চাঁদের দেশে আবাসস্থল গড়ার স্বপ্ন পূরণ করতে যাচ্ছে সে সময়ও রকমারি সমস্যার জালে আটকা সারা বিশ্বের মানুষ। অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাবলির মধ্যে ক্রমবর্ধমান জন বিস্ফোরণ, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, মূর্খতা, বেকারত্ব, স্বাস্থ্যহীনতা, দ্রব্যমূল্যের লাগামহীনতা, অর্থনৈতিক মন্দা ও অস্থিরতা উল্লেখযোগ্য। সমাজের বসবাসরত মানুষের মধ্যে শ্রেণী বিভক্তি, বংশগত পার্থক্য, নারী স্বাধীনতা ও নারী উন্নয়ন, বিধস্ত পারিবারিক ব্যবস্থা, মাদকদ্রব্যের ব্যবহার ও মদ্যপান, আইন অমান্য করা, অবৈধ পন্থায় সম্পদ অর্জনের হিড়িক, ধর্মহীনতা, সামাজিক স্বেচ্ছাচারিতা, নাস্তিকতা, সমাজের সর্বস্তরে নিরাপত্তাহীনতা, রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থাপনা, নির্লজ্জতা ও পশ্চিমাদের তোষামোদ, সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতির মহোৎসব ইত্যাদি আজকের উল্লেখযোগ্য সমস্যাবলি। উল্লিখিত সমস্যাবলির মধ্যে উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি বিষয়ে মহানবী (সা.)-এর সীরাতের আলোকে সমাধান।

১. ক্রমবর্ধমান জন বিস্ফোরণ

বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হলো জনসংখ্যা বৃদ্ধি। যা আমাদের মতো দরিদ্র দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও জনকল্যাণের জন্য বড় হুমকি মনে করা হচ্ছে। উপার্জন ও উন্নত জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে মানুষ যে হারে আঁচড়ে পড়া ঢেউয়ের মতো শহরমুখী হচ্ছে সমাজবিজ্ঞানীরা এতে দারুণভাবে শঙ্কিত। নগরবিদরা হৈ-হুল্লোড় শুরু করে দিয়েছে রীতিমতো। হিসাব-নিকাশ শুরু হয়ে গেছে নানাভাবে। বড় বড় শিরোনাম করা হচ্ছে জাতীয় মিডিয়াগুলোতে। এই স্রোত ঠেকাতে হবে, না হয় বিপর্যয় নেমে আসবে।

অথচ এর সমাধান মহানবী (সা.)-এর সীরাতে সুস্পষ্ট। "তোমরা নিজ সন্তানদেরকে এই শঙ্কায় হত্যা করো না যে তারা তোমাদের রিজিকে ভাগ বসাবে।" মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই জীবন উপকরণ দিয়ে থাকি, নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মারাত্মক অপরাধ। (সূরা বনী ইসরাঈল-৩১)

মহান আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন- আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে ঠাঁই দিয়েছি এবং তোমাদের জীবিকা নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। (সূরা আ'রাফ-১০) মহানবী (সা.) ইরশাদ করেন রিজিকের দরজা আরশ পর্যন্ত খোলা এবং জীবিকা উপার্জনের মাধ্যম অপরিসীম। (কুনুজুল হাকায়েক পৃ. ৪১৫)

বাস্তবতা হলো, জনসংখ্যা বৃদ্ধি মহান আল্লাহর রহমত ও নেয়ামত যদি তাদেরকে সঠিক উপায়ে কাজে লাগানো যায় এবং পরিকল্পনামাফিক পরিচালনা করা যায়। তাহলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি উৎকণ্ঠিত হওয়ার মতো কোনো বিষয় নয় বরং তা উন্নয়নের জন্য উপকারী। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, "এবং তোমাদেরকে সেখানে কিছুকাল অবস্থান করতে হবে ও লাভ সংগ্রহ করতে হবে।" (সূরা বাকারা-৩৬) বোঝা যায়

জমিন মানুষেরই ঠিকানা ও আবাসস্থান এবং জীবিকার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, আমি তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বণ্টন করেছি পার্থিব জীবনে। (সূরা যুখরফ-৩২) মহানবী (সা.) ইরশাদ করেন, কোনো মানুষের অধিকার নেই তার প্রয়োজনীয় মাথা গোঁজার ঠাঁই, ইজ্জত হিফাজতের পোশাক ও ক্ষুধানিবারণের রুটির টুকরা এবং তৃষ্ণা নিবারণের পানি ব্যতীত অন্য কিছুর ওপর। (মিশকাত হা. ৫১৮৬)

উল্লিখিত কুরআনের আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় জনসংখ্যার বৃদ্ধি পাওয়া ওই সময় পর্যন্ত উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার কারণ হবে না যতক্ষণ মানুষ একে অপরের হাত ধরে তাকদীরের অপেক্ষা করবে না। না হয় উপার্জনের উপায় ও মাধ্যম তো অনেক সৃষ্টি করেছেন মহান আল্লাহ তা'আলা।

২. নিরক্ষরতা ও মূর্খতা :

মূর্খতাকে সমাজ থেকে নির্বাসিত করা ও শিক্ষার অগ্রগতি ও উন্নতি সাধন সময়ের অপরিহার্য দাবি। কেননা ইসলামী দুনিয়া বিশেষত বিজ্ঞান ও শিক্ষায় অন্যান্য জাতি ও গোষ্ঠীর তুলনায় অনেক পশ্চাৎপদ। তাই বর্তমান সময়ে অতীব জরুরি যে মহানবী (সা.)-এর সীরাতের আলোকে আমরা নিরক্ষরতাকে শিক্ষার আলোতে কিভাবে পরিবর্তন করতে পারি। যাতে আমরাও উন্নতির ধাপ মাড়িয়ে সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছতে পারি। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর অবতীর্ণ প্রথম ওহীর শব্দ থেকে ইলম ও শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। এরপর সূরা কলমে মহান আল্লাহ কলম ও লেখার শপথ করেছেন। নবী করীম (সা.) শিক্ষার উন্নতি বিষয়ে ইরশাদ করেন, "ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরজ।" (ইবনে মাজাহ হা. ২২৪)

মহানবী (সা.)-এর ইলম অর্জনের ধারণা কুরআন এভাবে উপস্থাপন করেছে যে বলুন হে আমার পালনকর্তা, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন। (তোয়াহা-১১৪)

আহলে ইলমদেরকে অতিরিক্ত সম্মানে ভূষিত করে তাদের মর্যাদা মহান আল্লাহ এইভাবে বর্ণনা করেন যে, "বলুন যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে?" (সূরা যুমার-৯)

ইলমের মাধ্যমেই আল্লাহ রাববুল আলামীনের বিধিবিধান ও নিয়মনীতির বাস্তব পরিচয় পাওয়া যায়। আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন, "আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাকে ভয় করে।" (সূরা ফাতির-২৮)

মহানবী (সা.) ইরশাদ করেন, "তোমাদের মধ্যে উত্তম ওই ব্যক্তি যে কুরআন শিক্ষা দেয় ও গ্রহণ করে।" (বুখারী হা. ৫০২৭)

অন্য এক বর্ণনায় মহানবী (সা.) ইরশাদ করেন, "আমাকে শিক্ষক বানিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।" (ইবনে মাজাহ হা.-২২৯)

মহানবী (সা.) মক্কায় হযরত খাদিজা (রা.)-এর ঘরে এরপরে দারে আরকামে এবং শুয়াবে আবি তালিব নামক স্থানে শিক্ষার এই ধারাবাহিকতা বহাল রাখেন। মদীনা মুনাওয়ারায় মসজিদে নববীতে সুফফা নামক দরসেগাহ ছিল, তদ্রূপ অন্যান্য মসজিদের মধ্যেও শিক্ষা দীক্ষার ধারাবাহিকতা বহাল ছিল। মহানবী (সা.) তাদেরকে কুরআন, হাদীস, ফিকহ এবং দ্বীনের অন্যান্য সব বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.) ফজরের নামায আদায় করে মসজিদে তাশরীফ রাখতেন। আমরা মহানবী (সা.)-এর চারপাশে বসে যেতাম। আমাদের মধ্যে অনেকে পবিত্র কুরআনের বিষয়ে আবার অনেকে ফরায়েজ তথা সম্পদ বণ্টন ও স্বপ্নের ব্যাখ্যা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করত। মহানবী (সা.)-এর যুগে ঘরে ঘরে পবিত্র কুরআনের শিক্ষার সাধারণ রেওয়াজ হয়ে গিয়েছিল। পারিবারিক মকতব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। সাহাবায়ে কেরাম তাদের সন্তান-সন্ততি, নাতি-নাতনী–স্ত্রী সবাই পবিত্র কুরআন শিক্ষায় মনোযোগী ছিলেন। (মাজমাউজ যাওয়ায়েদ ১/৪৮)

হযরত আবু দারদা (রা.) বলেন, মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একবার ইলমে দ্বীন উঠে যাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করলেন। তখন হযরত যিয়াদ ইবনে লবীদ আনসারী বিয়াজী (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের মধ্য থেকে ইলম কিভাবে উঠে যাবে? অথচ আমরা কুরআন পড়েছি। আল্লাহর কসম আমরা পবিত্র কুরআন পড়ি, আমরা আমাদের স্ত্রীদেরকে পড়াব এবং সন্তানদেরকেও পড়াব। (তিরমিযী-৯০২)

উক্ত ঘটনা দ্বারা স্পষ্ট অনুমিত হয় যে মদীনা মুনাওয়ারায় পারিবারিক মাদরাসার আধিক্য কী পরিমাণ ছিল।

মহানবী (সা.) শিক্ষা-দীক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ যদিও মক্কা মুকাররমায় থাকতে করেছিলেন তবে তার অধিক প্রচার ও প্রসার ঘটে মদীনা মুনাওয়ারায়। হিজরতের পূর্বে হযরত মুছ'আব ইবনে উমাইর (রা.) একটা

ঘরে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেছিলেন। এই ধারাবাহিকতা মহানবী (সা.)-এর আগমনের পর আসহাবে সুফফার আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। যেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা এসে অবস্থান করতেন এবং শিক্ষা অর্জন করতেন। স্বনামধন্য বিখ্যাত হাফিজে হাদীস ছিলেন হযরত আবু হুরাইরা (রা.) যার থেকে ৫০০০-এর ও অধিক হাদীস বর্ণিত। তিনি নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন ইলমে দ্বীন অর্জন করার জন্য। নববী শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট হলো এতে শিক্ষার পাশাপাশি তরবীয়ত ও আত্মশুদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়, যা অন্য শিক্ষাব্যবস্থায় অনুপস্থিত।

৩. ধন ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা :

বর্তমান বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ একটা সমস্যা হলো বিশ্ব অর্থব্যবস্থার ওপর ধন ও সমাজতান্ত্রিকতার কালো থাবা। যে সকল দেশে ধনতন্ত্রের প্রভাব সেখানে গুটি কয়েক পুঁজিপতি এবং যে দেশে সমাজতন্ত্রের প্রভাব সেখানে হাতেগোনা সমাজতন্ত্রী পুরো রাষ্ট্রব্যবস্থা ও অর্থ উপার্জনের উৎস ও মাধ্যমগুলোর ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে রেখেছে। অথচ দরিদ্র, শ্রমজীবী ও মজদুর শ্রেণী এক মুঠো ভাতের জন্যও মুখাপেক্ষী। উল্লিখিত অর্থব্যবস্থাদ্বয়ের কালো থাবার শিকার আজকের গোটা দুনিয়া।

মহানবী (সা.) যেই কল্যাণময় রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি রেখে গেছেন, সেখানে নেই পুঁজিবাদের স্থান ও সমাজতন্ত্রের পাত্তা। মহান রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন, "তাদের মালামাল থেকে জাকাত গ্রহণ করো।" (তাওবা-১০৩) উক্ত আয়াতে নবী করীম (সা.) কে মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন বিত্তবানদের থেকে জাকাত উসুল করার জন্য।

মহানবী (সা.) হালাল উপার্জনের নির্দেশ দিয়েছেন উম্মতকে, নিষিদ্ধ করেছেন সুদকে। হারাম করেছেন জুয়া ও ছাট্টাকে। নাজায়েয বলেছেন গুদামজাতকরণ, মাপ ও ওজনে কম দেওয়াকে, আরো হারাম করেছেন অবৈধ মুনাফাখোরীকে।

হালাল রিজিক উপার্জন করার ওপর উৎসাহ জুগিয়েছেন, পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

হে মানবমণ্ডলী, পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তুসামগ্রী ভক্ষণ করো। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। সে নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (সূরা বাকারা-১৬৮)

মহান রাব্বুল আলামীন অন্য আয়াতে উপার্জনের অবৈধ পন্থাগুলো রুদ্ধ করে দেওয়ার নিমিত্ত ইরশাদ করেন-'হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। যাতে তোমরা কল্যাণ অর্জন করতে পারো। (সূরা আলে ইমরান-১৩০)

মহান আল্লাহ অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয়, তা বৈধ। (নিসা ২৯)

মহানবী (সা.) জাকাতের দর্শন এভাবে ইরশাদ করেছেন যে, সমাজের ধনীদের থেকে নেওয়া হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করা হবে। (বুখারী হা. ১৩৯৫) মহানবী (সা.) নিজে কোনো দিন অভাবী ভিক্ষুককে খালি হাতে ফেরত দেননি।

নবী করীম (সা.) সাহাবাদের মাঝে একদা সম্পদশালী হওয়া ও দুনিয়াতে অবস্থাসম্পন্ন হওয়া ভালো না মন্দ, পরকালের জন্য উপকারী না ক্ষতিকর-এ বিষয়ে আলাপ করতে ছিলেন। তখন প্রিয় নবী (সা.) ইরশাদ করলেন যে যে ব্যক্তি খোদাকে ভয় করবে এবং আল্লাহর বিধিবিধান যথাযথ পালন করবে তার জন্য ধনবান ও সম্পদশালী হওয়া ক্ষতিকর নয়। তিনি আরো ইরশাদ করেন, সুস্থতা মুত্তাকীদের জন্য সম্পদশালী হওয়ার চেয়ে উত্তম। এবং মনের আনন্দ থাকা এটাও আল্লাহ তা'আলার অফুরন্ত নেয়ামত। সুতরাং তার উপরও শোকর আদায় করা অপরিহার্য। (সীরাতে ইবনে হিশাম)

৪. দারিদ্র্য :

বর্তমান বিশ্বের জটিল একটা সমস্যা দারিদ্র্য, যার মৌলিক কারণ হলো, উন্নত বিশ্ব ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক অঙ্গনে নিজেদের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে রেখেছে। যার ফলে অনুন্নত দেশসমূহ অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। উন্নত দেশগুলো না অনুন্নত দেশের তৈরি ও উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য ক্রয় করে, না আন্তরিকভাবে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কামনা করে। অর্থনৈতিক সুদী অর্থব্যবস্থার গ্যাঁড়াকলে পিষ্ট হয়ে তাদের আর্থিক অবস্থা দৈনন্দিন আরো অবনতিশীল। অথচ পক্ষান্তরে উন্নত দেশসমূহ তাদের অভ্যন্তরে ব্যবসাকে উন্নতি করে যাচ্ছে।

মহানবী (সা.)-এর সীরাতে এই জটিল সমস্যার সমাধানও বিদ্যমান। মহানবী (সা.) এক কল্যাণময় রাষ্ট্রব্যবস্থার বুনিয়াদ রেখে গেছেন দুনিয়াবাসীর জন্য। জাকাত, সদকার ব্যবস্থাপনার

মাধ্যমে দারিদ্র্যকে নির্বাসিত করেছেন সমাজ থেকে এবং একে অপরের সহযোগিতাকে নাম দিয়েছেন ভ্রাতৃত্বের। মহান আল্লাহ মহানবী (সা.) কে সমাজের ধনী শ্রেণী থেকে জাকাত উসুল করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুদকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর বলেছেন। কেননা সুদী কারবারও দারিদ্র্যের অনন্য কারণ বটে। তাই তো মহান রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে তা পরিত্যাগ করো, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো। অতঃপর যদি তোমরা পরিত্যাগ না করো, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। (সূরা বাকারা ২৭৮-২৭৯)

মহানবী (সা.) ইরশাদ করেন, সুদের পাপ সত্তরের অধিক, তন্মধ্যে সর্বনিম্ন অপরাধ হলো, আপন মায়ের সাথে জিনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। (ইবনে মাজাহ হা. ২২৭৪)

মহানবী (সা.) যখন মুসলমানদের জন্য সুদী লেনদেনের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন তখন তিনি এও ঘোষণা করলেন যে সবার আগে আমি আমার চাচাজান আববাসের সুদ মাফ করে দিলাম। মহানবী (সা.) অন্য এক হাদীসে ইরশাদ করেন, উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কুরআনের বিধান মতে সম্পদ বণ্টন করো। (আবু দাউদ হা. ২৮৯৮)

ইসলামী সমাজব্যবস্থায় সম্পদের বিবর্তনকেই সুস্থ সমাজব্যবস্থা হিসেবে অবিহিত করা হয়েছে। যেমনটা পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, "যাতে ধনৈশ্বর্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়।" (সূরা হাশর-৭)

তেমনিভাবে পবিত্র কুরআনে ঈমানদারের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ হয়েছে এইভাবে যে এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদের অগ্রাধিকার দান করে, যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত তারাই সফলকাম। (সূরা হাশর-৯)

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা জীবন উপকরণে তোমাদের একজনকে অন্যজনের চাইতে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। অতএব যাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে, তারা তাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদেরকে স্বীয় জীবিকা থেকে এমন কিছু দেয় না, যাতে তারা এ বিষয়ে তাদের সমান হয়ে যাবে। তবে কি তারা আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার করে? (সূরা নাহাল-৭১)

তদ্রূপ মহান আল্লাহ অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন এবং যাদের ধন-সম্পদে নির্ধারিত হক্ব আছে। যাঞ্চাকারী ও বঞ্চিতদের। (সূরা আল মা'আরিজ-২৪-২৫)

দারিদ্র্যবিমোচনে মহানবী (সা.) অনেক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন যথা, একদা এক ব্যক্তিকে নবী করীম (সা.) ভিক্ষা করতে দেখে তাকে বারণ করলেন এবং বললেন তোমার ঘরে কি কোনো জিনিস আছে? সে বলল, একটা মোটা কম্বল আছে। যার একাংশ উপরে ও অপরাংশ নিচে বিছিয়ে থাকি। এবং একটি পাত্র আছে, যদ্দারা আমি পানি পান করি। তখন নবী করীম (সা.) বললেন যাও তোমার বস্তুদ্বয় নিয়ে আসো। ওই ব্যক্তি বস্তুদ্বয় নবী করীম (সা.)-এর সম্মুখে হাজির করলে প্রিয় নবী (সা.) বস্তুদ্বয় হস্তমুবারকে নিলেন এবং বললেন কেউ আছ কি এইগুলো কিনবে? এক ব্যক্তি বললেন, আমি এক দিরহাম দিয়ে কিনব। মহানবী (সা.) বললেন এর চেয়ে বেশি দিয়ে কেনার কেউ আছ? অপর এক ব্যক্তি বললেন, আমি দুই দিরহাম দিয়ে কিনব। নবী করীম (সা.) উভয় বস্তু ওই ব্যক্তির কাছে দুই দিরহাম দ্বারা বিক্রি করে ভিক্ষাকারী আনসারী ব্যক্তিকে দিয়ে বললেন এক দিরহাম দ্বারা খাদ্যদ্রব্য কিনে পরিবারের সদস্যদেরকে দিয়ে দাও এবং অপর দিরহাম দ্বারা একটা কুড়াল ক্রয় করে আমার নিকট নিয়ে আসো। সে ব্যক্তি যখন কুড়াল নিয়ে মহানবীর দরবারে হাজির হলেন, তখন মহানবী (সা.) নিজ হাতে কুড়ালের হাতল লাগিয়ে দিলেন এবং বললেন, যাও কাঠ কেটে বিক্রি করো। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বললেন, আমি যাতে তোমাকে ১৫ দিন আর না দেখি। ওই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশে চলে গেল ও লাকড়ি একত্রিত করে বিক্রি করতে থাকল। পনের দিন পর সেই ব্যক্তি মহানবীর দরবারে যখন আগমন করে তখন তার সঞ্চয় ছিল ১০ দিরহাম। যার থেকে কিছু দ্বারা সে খাদ্যদ্রব্য কিনল আর কিছু দ্বারা কাপড়চোপড় ইত্যাদি। মহানবী (সা.) তাকে উদ্দেশ করে বললেন ভিক্ষাবৃত্তির কারণে কাল কিয়ামতের দিন চেহারা অন্ধকার হওয়া থেকে এই পন্থাই তোমার জন্য উত্তম। (মিশকাত পৃ. ১৬৩)

মুসলমানরা মজুরি করত এবং মহানবী (সা.)ও কাজ করতেন। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ ভিক্ষাবৃত্তি করতেন না এবং তা পছন্দও করতেন না। মহানবী (সা.) দরিদ্র শ্রেণীকে ভালোবাসতেন এবং তাদের সাথে মিলেমিশে জীবনযাপন পছন্দ করতেন। তাই তো নবী করীম

(সা.) ইরশাদ করেন, আমাকে দুর্বলদের মাঝে খোঁজো, তোমাদেরকে দুর্বলদের উছিলায় রিজিক দেওয়া হয় এবং তোমাদেরকে সাহায্য করা হয়। (মিশকাত হা. ৫২৪৬)

মহানবী (সা.) আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করতেন, হে আল্লাহ আমাকে মিসকীন হিসাবে জীবিত রাখ, মিসকীন অবস্থায় মৃত্যু দাও এবং কিয়ামত দিবসে মিসকীনদের দলে উঠাও। (মিশকাত হা. ২৩৫২)

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আল্লামা ইকবাল লিখেন-

فقیری میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے
کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا

বোঝা যায় গরিব হওয়া অভিশাপ নয় বরং এতেও মানুষ নিজের ইজ্জত, স্বকীয়তা ও সম্মানের প্রতি সযত্ন থাকে। মাথা নত করে না আল্লাহ ব্যতীত কোনো শক্তি ও পরাশক্তির কাছে।

৫. নারী স্বাধীনতা :

বর্তমান সভ্য দুনিয়ার এক বহুল প্রচলিত স্লোগান হলো নারী স্বাধীনতা, নারীর সমঅধিকার ও নারী উন্নয়ন। এ সম্পর্কে ইসলামের দুশমনেরা ইসলামের ওপর অপবাদ আরোপ করে যে, ইসলাম নারীদের এই সব বিষয়ে তাদের ওপর অন্যায় করেছে এবং তাদের অধিকার হরণ করে তাদেরকে ঘরের কোণায় আবদ্ধ করে তাদের ওপর অবিচার করেছে এবং পশ্চিমা দুনিয়ায় নারী স্বাধীনতা, নারী উন্নয়ন ও সমঅধিকারের ধোয়া তুলে নারীসমাজকে সুকৌশলে প্রতারণার জালে আবদ্ধ করে তাদেরকে জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে পুরুষদের সমান বা আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে। ওরা এখন শুধু নাইট ক্লাবের অলংকার নয়, বরং পুরুষের মনোরঞ্জনের হাতিয়ার হিসেবে প্রাইভেট সেক্রেটারি থেকে শুরু করে অফিসের বিভিন্ন পদে এবং এয়ার হোস্টেজ ও ফটোগ্রাফার পর্যন্ত দেখা যায়। পণ্যের বিজ্ঞাপনেও মহিলাদের ব্যবহার চোখে পড়ার মতো। এর দ্বারা সমাজের শান্তি ও স্থিতিশীলতার বিপরীতে অশান্তি ও অস্থিরতার মহোৎসব পরিলক্ষিত হয়। অথচ ইসলাম মানব হিসেবে নারী-পুরুষকে সমান মর্যাদা দান করেছে। আকাঈদ বিষয়ে নারী-পুরুষ সমান, ভালো-মন্দের পরিণামেও উভয়ে সমান। অপরাধের সাজাতেও রাখা হয়েছে সমতা, মালিকানাধীন বস্তুর ব্যবহারেও সমান অধিকার দিয়েছে ইসলাম। তবে নারী ও পুরুষের সৃষ্টিগত যোগ্যতা, শারীরিক অবকাঠামোর ভিন্নতার কারণে ইসলাম তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পার্থক্য করেছে। ঘরের চৌহদ্দির বাইরের কার্যাদির ভার পুরুষের ওপর অর্পণ করা হয়েছে। সন্তান-সন্ততিদের লালন-পালন থেকে শুরু করে ঘরের অভ্যন্তরীণ কাজ কারবার আঞ্জাম দেওয়ার দায়িত্ব মহিলাদের ওপর অর্পণ করেছে ইসলাম। তার বাস্তবতা হলো মহানবী (সা.)-এর যুগে ও মহিলাদের এই স্বাধীনতা ছিল তারা তাদের বক্তব্য অভিযোগ উত্থাপনের অধিকার পেত। উদাহরণস্বরূপ পবিত্র কুরআনে হযরত খাওলা বিনতে ছা'লাবা (রা.)-এর ঘটনা এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যে নারী তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং অভিযোগ পেশ করছে আল্লাহর দরবারে, আল্লাহ তার কথা শুনেছেন। আল্লাহ আপনাদের উভয়ের কথাবার্তা শোনেন। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছু শোনেন। সব কিছু দেখেন। (মুজাদালাহ-১)

একদা নবী করীম (সা.) সাহাবায়ে কেরামদের সাথে আসীন ছিলেন এমতাবস্থায় হযরত আসমা (রা.) মহানবীর দরবারে হাজির হয়ে বললেন, আল্লাহর রাসূলের ওপর আমার মাতা-পিতা উৎসর্গ হোক। আমি মুসলিম নারীসমাজের পক্ষ থেকে এই আবেদন নিয়ে হাজির হয়েছি যে, মহান আল্লাহ আপনাকে নারী-পুরুষের হিদায়াতের জন্য প্রেরণ করেছেন। আমরা সবাই আপনার অনুসারী এবং আপনার ওপর ঈমান এনেছি। কিন্তু আমরা দেখতে পাই, নারী ও পুরুষের মধ্যে অনেক পার্থক্য যথা- আমরা ঘরে আবদ্ধ থাকি সারাক্ষণ। ছেলে সন্তানদের লালন-পালন একক আমাদেরকে করতে হয়। এককভাবে পুরুষেরা জুম'আ ও জানাযার নামাযে অংশ গ্রহণ করতে পারে, আমরা পারি না। আপনারা হজ্ব করেন, সবচেয়ে বড় কথা আপনারা আল্লাহর রাহে জিহাদ করতে পারেন, অথচ আমরা উক্ত বিষয়সমূহে আপনাদের সাথে থাকতে পারি না। আপনাদের সম্পদের হেফাজত আমরাই করে থাকি। পোশাকের জন্য চরকা ঘুরাতে থাকি। আমরা জানতে চাই সওয়াবের মধ্যে আমরা আপনাদের সাথে শরীক থাকব কি না? তার এ বক্তব্য শোনার পর মহানবী (সা.) উপস্থিত সাহাবায়ে কিরামের দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং বললেন, তোমরা কি কোনো মহিলা থেকে ধর্মীয় বিষয়ে এ ধরনের বক্তব্য কখনো শুনেছ? উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম জবাবে বললেন আমরা তো কোনো দিন কল্পনাও করিনি যে, কোনো মহিলার পক্ষ থেকে এই ধরনের কোনো প্রশ্ন আসতে পারে। তখন মহানবী (সা.)

বললেন, যদি কোনো মহিলা নিজের স্বামীর সন্তুষ্টি ও আনুগত্য অর্জন করে এবং সাংসারিক দায়দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে তবে সেও পুরুষের ন্যায় সওয়াবের অধিকারী হবে। (সীরাতে নববী মে আওরাত কা কিরদার পৃ. ১০৫-১০৬)

৬. ধর্মীয় উগ্রতা, নিরাপত্তাহীনতা, আন্তর্জাতিক অব্যবস্থাপনা:

মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাবকালে বিশ্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেমন নাজুক ছিল তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। ওই সময় পৃথিবীর রাজত্ব ছিল দুই সভ্য সুপার পাওয়ারের নিয়ন্ত্রণে। এক রোমান, দুই পারস্য সাম্রাজ্য। উক্ত সুপার পাওয়ারগুলোর অভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধের কারণে পুরো বিশ্বের নিরাপত্তাব্যবস্থা ছিল বিধ্বস্ত। সম্পদ ছিল গুটিকয়েকের হাতে কুক্ষিগত। সমাজে ছিল শ্রেণীবিভক্তি। বিভিন্ন ধর্ম ও মতাদর্শের অনুসারীদের মধ্যে ছিল ধর্মীয় উগ্রতা ও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি। ফলে পৃথিবীজুড়ে ছিল হতাশা ও হাহাকার। পবিত্র কুরআনে এর চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এভাবে, স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। (সূরা আররুম-৪১)

এমতাবস্থায় মহান রাব্বুল আলামীন রহমতের নবীকে বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত বানিয়ে প্রেরণ করেন এবং ইরশাদ করেন- তোমাদের কাছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি এসেছে এবং একটি সমুজ্জ্বল গ্রন্থ। এর দ্বারা যারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে তাদেরকে নিরাপত্তার পথপ্রদর্শন করেন এবং তাদেরকে স্বীয় নির্দেশ দ্বারা অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে আনয়ন করেন। (সূরা মায়েদা-১৫-১৬)

মহান রাব্বুল আলামীন প্রেরিত নবীগণ দ্বারা তাওহীদের দাওয়াত দেওয়ার মাধ্যমে ধর্মীয় উগ্রতা ও সাম্প্রদায়িকতা নিরসনের ব্যবস্থা করেন। যথা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে- হে আহলে কিতাবগণ! একটি বিষয়ের দিকে আসো, যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করব না, তার সাথে কোনো শরীক সাব্যস্ত করব না এবং একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া কাউকে পালনকর্তা বানাব না। তারপর যদি তারা স্বীকার না করে, তা হলে বলে দাও যে, সাক্ষী থাকো, আমরা তো অনুগত। (সূরা আলে ইমরান-৬৪) তেমনিভাবে বিরোধপূর্ণ অন্য সব সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ মহানবী (সা.) গ্রহণ করেছিলেন। যেমনটা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, হে মানব! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সেই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেজগার। (সূরা হুজুরাত-১৩) মহানবী (সা.) বিদায় হজ্বের ভাষণে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন, কোনো শেতাঙ্গকে কৃষ্ণাঙ্গের ওপর, কোনো অনারবকে আরবের ওপর তাকওয়া ব্যতীত কোনো প্রকারের প্রাধান্য দেওয়া হবে না।

মহানবী (সা.) কোনো অমুসলিমকে পত্র লেখার সময় কোনো প্রকারের অযাচিত ও অশোভন পদ্ধতি অবলম্বন করতেন না। বরং বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম দ্বারা শুরু করতেন এবং 'ছালামুন আলা মান ইত্তাবা' আল হুদা' দ্বারা শান্তির ও হেদায়তের পয়গাম পেশ করতেন।

মহানবী (সা.)-এর দরবারে নাজরান থেকে খ্রিস্টান প্রতিনিধিদল আগমন করলে মহানবী (সা.) তাদের যথোপযুক্ত মেহমানদারী করলেন এবং মসজিদে নববীতে তাদের ধর্ম মতো ইবাদত করার সুযোগ করে দিলেন। এর দ্বারাও ইসলামের নবী, বিশ্ব নবীর (সা.) অসাম্প্রদায়িকতা প্রমাণিত হয়।

হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে মুশরিকদের চাপিয়ে দেওয়া অযৌক্তিক শর্তাবলি মেনে নেওয়া মহানবীর দূরদর্শিতা ও সন্ধিপ্রিয়তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মদীনায় বসবাসরত ইহুদীদের সাথে মহানবীর সদাচরণ ও প্রণীত মদীনা সনদ পৃথিবীর সব ধর্মাবলম্বীদের জন্য আলোকবর্তিকাস্বরূপ।

৭. সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য :

ইসলামপূর্ব আরবের অবস্থা ছিল অস্বাভাবিক ও অবর্ণনীয়। কথায় কথায় ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়া তাদের জাতীয় অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। আবার গোত্রীয় বন্ধন, বংশীয় অহংকার ওই সব নিছক ঝগড়াকে দস্তর মতো যুদ্ধে পরিণত করত। তাছাড়া তাদের মধ্যে বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিল যে যতক্ষণ নিহতের রক্তের বদলা নেওয়া হবে না, ততক্ষণ তার আত্মা পাখির রূপ ধারণ করে ধারাবাহিক চিৎকার করতে থাকবে যে আমি তৃষ্ণার্ত, আমার হত্যাকারীর রক্ত দ্বারা বা তার গোত্রের কারো রক্ত দ্বারা আমার পিপাসা নিবারণ করো। এই কুধারণার ফলে অনেক সময় তাদের যুদ্ধ শতাব্দী পর্যন্ত গড়াত।

দুনিয়া থেকে সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের মুলোৎপাটন করে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই মূলত মহান আল্লাহ যুগে যুগে নবী ও

রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছেন।

মহানবী (সা.) কে যখন মহান আল্লাহ সর্বশেষ রাসূল বানিয়ে প্রেরণ করেন, তখন দুনিয়া ছিল জুলুম ও অত্যাচারে ভরা। মহানবী (সা.) এই পৃথিবীজুড়ে নৈরাজ্য ও সন্ত্রাসকে বড় সতর্কতা ও দক্ষতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। অনেক সময় এমন পদক্ষেপও গ্রহণ করেছেন, যা বাহ্যিকভাবে দেখলে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য আত্মঘাতী মনে হতো কিন্তু এর পরিণতি হতো অত্যন্ত শুভ ও অভাবনীয় কল্যাণকর। (রাসূলে আকরাম বহাইছিয়তে সিপাহসালার পৃ. ৪১-৪৪)

৮. মদপান ও মাদকদ্রব্যের ব্যবহার :

তৎকালীন যুগে আরবে মদের এত প্রচলন ছিল যে প্রায় পুরুষ মদপানে অভ্যস্ত ছিল। শিশু ও নারীদেরকে পান করানোর দায়িত্বে নিয়োগ দেওয়া হতো। ভিআইপি স্পটে মদের আসর বসানো হতো রীতিমতো। যেখানে হরদম চলতো মদের আসর এবং নিদর্শনস্বরূপ উড়িয়ে দেওয়া হতো বিশেষ পতাকা।

ইসলামে যেই ধীরগতিতে পর্যায়ক্রমে মদককে হারাম করা হয়েছে এ থেকে প্রমাণিত হয় কিভাবে মাদক ও মদের সাগরে সারাদেশ ও জাতি নিমজ্জিত ছিল। যতক্ষণ না পরিষ্কার ভাষায় ও স্পষ্টভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় ততক্ষণ মানুষ বুঝতেই পারেনি।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় , মদ ও মাদকদ্রব্য সদা সর্বদা মানবতার ক্ষতি ও ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই উপহার দিতে পারেনি দুনিয়াকে। মহানবী (সা.) সেই জাহেলি যুগেও এই ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হননি কোনো দিন ভুলেও। বর্তমানেও মহানবীর আদর্শ অনুসরণ করে আমাদের জন্য ওই সব ক্ষতিকর পণ্য ব্যবহার, পান করা, তৈরি, বাজারজাত ও ক্রয়-বিক্রয় থেকে বিরত থাকা অতীব জরুরি।

কেননা এসব দ্রব্যকে ইসলাম চূড়ান্তভাবে হারাম করেছে চিরদিনের জন্য। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, "হে মুমিনগণ! এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্যনির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ তো নয়। অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাকো, যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও। (সূরা মায়েদা-৯০)

আসুন আমরা গুরুত্ব সহকারে মহানবী (সা.)-এর সীরাত পড়ি ও জীবনকে মহানবীর আদর্শে গড়ি, সমাজের সর্বত্র নবীর সুন্নাত ও সীরাতকে প্রতিষ্ঠা করি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন!

আত্মশুদ্ধির পথে মাসিক আল-আবরারের স্বার্থক দিকনির্দেশনা অব্যহত থাকুক

টাইলস এবং সেনিটারী সামগ্রীর বিশ্বস্ত ও ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান

Importers & General Marchant of Sanitary Goods & Bath Room Fittings

J.K SANITARY

Shop # 10, Green Super Market (Ground Floor) Green Road Dhaka 1205, Bangladesh
Tel : 0088-02-9135987 Fax : 0088-02-8121538 Mobile : 0088-01675 209494, 01819 270797
E-mail: taosif07@gmail.com

Rainbow Tiles

2, Link Road, Nurzahan Tower, Shop No: 09
80/20 Mymansing Road, Dhaka, Bangladesh
Tel : 0088-02-9612039,
Mobile : 01674622744, 01611527232
E-mail: taosif07@gmail.com

Monalisa Tiles

25/2 Bir Uttam C.R. Dutta Road
Hatirpool, Dhaka, Bangladesh.
E-mail: taosif07@gmail.com
Tel: 0088-029662424,
Mobile: 01675303592, 01711527232

বি.দ্র. মসজিদ মাদরাসার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ থাকবে

বিশ্বমানবতার মুক্তির দিশারী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সুন্নতি আদর্শ ও আজকের দাবি

মাওলানা আবদুর রহীম ইসলামাবাদী

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন বিশ্বমানবতার মুক্তির দিশারী। মানুষকে অত্যাচার, অন্যায়, জুলুম ও নিপীড়ন থেকে রক্ষা করে সত্যিকারভাবে ন্যায় বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় তিনি যে অবদান রেখেছেন, তা ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

সুদ ও ঘুষ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় বড় বাধা। সুদের মাধ্যমে মানুষ শোষিত হয়। ঘুষের কারণে ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন ভূলুণ্ঠিত হয়। ঘুষদাতা ঘুষ দিয়ে আইনকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করে। ঘুষ গ্রহণকারী ঘুষ নিয়ে অন্যের অধিকার হরণ করে। ন্যায়কে অন্যায়, অন্যায়কে ন্যায় করে দেয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, নবী করিম (সা.) লা'নত করেছেন ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতার ওপর। (মেশকাত শরীফ)

রাসূলে করিম (সা.) আরো ইরশাদ করেছেন : সরকারি বিচারককে যে হাদিয়া নিজের কাজ উসুলের জন্য দেয়া হয় তা ঘুষ। হযরত সওবান (রা.) থেকে বর্ণিত- ঘুষগ্রহীতা, ঘুষদাতা ও মধ্যস্থতাকারী সকলের ওপর আল্লাহর লা'নত-অভিশাপ (আহকামুল কোরআন)

রাসূলে করীম (সা.) যে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, খোলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবায়ে কেরামের যুগেও যা প্রচলিত ছিল, তা হলো ন্যায়বিচার ও কল্যাণকর সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা, ঘুষবিহীন সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সুদহীন অর্থব্যবস্থা। সে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় মানুষ মানুষকে ঋণ দিত সাওয়াবের আশায়। সুদ ছাড়াই মানুষ ঋণ পেত। যার কারণে অর্থনৈতিক শোষণ থাকত না সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায়। নবী করিম (সা.) ইরশাদ করেন : এক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করল। তখন তার তোরণে লেখা দেখল সদকার সাওয়াব দশ গুণ ও ঋণ দেয়ার সওয়াব আঠারো গুণ। (তাবারানী)

অন্য এক হাদীসে আছে নবী করিম (সা.) ইরশাদ করেন, আমি জিব্রাঈলকে জিজ্ঞেস করলাম। কী কারণে ঋণ দেয়া সদকা থেকে উত্তম? জিব্রাঈল উত্তর করলেন, ভিক্ষুক-ভিক্ষা করে অথচ তার কাছে কিছু থাকে, কিন্তু ঋণগ্রহীতা অপারগ হয়ে ঋণ তালাশ করে। (জামউল ফাওয়ায়েদ)

অন্য হাদীসে আছে, নবী করিম (সা.) ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি কোনো অভাবীকে সময় বাড়িয়ে দিল বা তার ঋণ থেকে কিছু মাফ করে দিল আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিনের পেরেশানি থেকে মুক্তি দেবেন। (মুসলিম শরীফ)

মদ, জুয়া, হাউজি ইত্যাদি সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। মদের সাথে সম্পৃক্ত দশ ব্যক্তির জন্য রাসুল (সা.) লা'নত করেছেন। (১) মদ প্রস্তুতকারী, (২) মদ্যপায়ী, (৩) যে পান করায়, (৪) যার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, (৫) বহনকারী, (৬) যার জন্য বহন করা হয়েছে, (৭) বিক্রেতা ও তার উকিল, (৮) ক্রেতা ও তার উকিল, (৯) মদের ওপর, (১০) মদের উপার্জন ব্যবহারকারী।

একইভাবে জুয়াকেও হারাম করা হয়েছে। সরকারি ক্ষমতা প্রয়োগ করে মদ, জুয়া ও হাউজিকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বন্ধ করা হলে সমাজে ও রাষ্ট্রে নৈতিকতা ফিরে আসবে।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মদীনায় আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য একটি মডেল রেখে গেছেন। নবীজি (সা.) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা গেলে বর্তমান বিশ্বে আবার শান্তি ফিরে আসবে। মানুষ পাবে মুক্তি। রাসূল (সা.)-এর ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, সৈনিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন ও আন্তর্জাতিক জীবনের সকল সুন্নত সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠা করার জন্য চেষ্টা করতে হবে এবং একে বাস্তবায়ন করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন ব্যাপক গবেষণা, প্রকাশনা, সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বাংলাদেশসহ সকল দেশের মানুষকে আল্লাহর হুকুম ও নবী করিম (সা.)-এর সুন্নত-তরিকা অনুযায়ী সার্বিক জীবন গঠন করার তাওফিক এনায়েত করুন। আমীন!

মক্কা বিজেতার অনুকম্পা

মুফতী শরীফুল আ'জম

দেশ দখল বা গদি দখল নয় ইসলাম জিহাদের বিধান রেখেছে সত্যকে মিথ্যার উপর প্রবল করার জন্য। ঐতিহাসিক মক্কা বিজয় যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

উল্লেখযোগ্য রক্তপাত ছাড়াই ইসলামের ঘোর শত্রু কুরাইশদের পরাজিত করার মাধ্যমে বিজিত হয়ে ছিল পবিত্র মক্কানগর। কুফর শিরকের কালিমামুক্ত হয়ে ছিল পবিত্র কাবাগৃহ। আর শহরের অধিবাসীরা হয়ে ছিল সাধারণ ক্ষমাপ্রাপ্ত। এমন যুদ্ধ জয়ের ঘটনা আর একটি দেখাতে ইতিহাস অপারগ। এটা সম্ভব হয়েছিল মহানবী (সা.)-এর মহৎ আদর্শের ফলে। এই মহান আদর্শের কথাই উচ্চারিত হয়েছে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

"আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।" (সূরা আল কলম-৪)

রাসূলে করীম (সা.)-এর সত্তায় আল্লাহ তা'আলা যাবতীয় উত্তম চরিত্র পূর্ণমাত্রায় সন্নিবেশিত করে দিয়েছিলেন। তিনি নিজেই বলেন, আমি উত্তম চরিত্রকে পূর্ণতা দান করার জন্য প্রেরিত হয়েছি। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বলেন, স্বয়ং কুরআন রাসূলে কারীম (সা.)-এর মহৎ চরিত্র। অর্থাৎ কুরআন পাক যেসব উত্তম কর্ম ও চরিত্র শিক্ষা দেয়, তিনি সেসবের বাস্তব নমুনা। জীবনের সকল ক্ষেত্রের ন্যায় যুদ্ধের ময়দানেও তাঁর পবিত্র আদর্শ বিশ্ববাসীকে আলোর পথ দেখায়।

একুশ বছরের নিগ্রহ :

দীর্ঘ একুশটি বছর যে জাতি মুসলমানদের ওপর নিষ্ঠুর নিপীড়ন চালায় তাদের পরাজয়ের সময় নবীজি (সা.) কে দয়ার্ত হতে দেখে সাহাবায়ে কেরামও হতভম্ব না হয়ে পারেননি। চল্লিশ বছরের পরীক্ষিত, সকলের আস্থাভাজন আল-আমীন (সা.) যখন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুওয়াতপ্রাপ্ত হয়ে গোত্রের লোকদের একত্রিত করে সাফা পর্বতে দাঁড়িয়ে শিরক ও কুফর ত্যাগের আহ্বান করলেন তখন যে জাতি বলে উঠেছিল, ধ্বংস হও তুমি, এজন্যই কি আমাদেরকে একত্রিত করেছ? একত্মবাদের দাওয়াতের বিরুদ্ধে যে জাতি ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলে ছিল। সত্যের আহ্বান নিস্তব্ধ করে দিতে মুহাম্মদকে (সা.) হত্যার পরিকল্পনা করেছিল। চাচা আবু তালেবের কাছে প্রিয়তম ভাতিজাকে হত্যার প্রস্তাব নিয়ে যারা দরকষাকষি করেছিল। ইসলাম ত্যাগে বাধ্য করার জন্য পাঁচশত সদস্যের অত্যাচার কমিটি গঠন করে ছিল। নামাযে সিজদারত অবস্থায় নবীজি (সা.)-এর গ্রীবাদেশে উটের নাড়িভুঁড়ি রেখে দিয়ে অট্টহাঁসিতে মেতে উঠে ছিল। তাদের উচিত শিক্ষা না দিয়ে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা সর্বকালের সেরা মানব নবীকুলের সরদার হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পক্ষেই একমাত্র সম্ভব ছিল। মক্কার কুরাইশগণ সম্ভাব্য সকল পন্থায় নির্যাতনের স্টিমরোলার চালিয়ে ছিল নবীপ্রেমিক সাহাবায়ে কেরামের ওপর। মরুভূমির তপ্ত বালুতে ফেলে, জলন্ত কয়লায় ঝলসে গলায় রশি বেঁধে পথে পথে হেঁচরিয়ে, খুত পিপাসার কষ্ট দিয়ে, নিষ্ঠুর প্রহারে অঙ্গহানি করে উৎপীড়ন চালাত তারা নিরীহ নিরস্ত্র মুসলমানদের ওপর। কিন্তু না কিছুতেই দমাতে পারেনি তারা এই নূরানী কাফেলার যাত্রা। অবশেষে তারা মুসলমানদের বয়কট করার প্রতিজ্ঞা করল। সকল লেনদেন বন্ধ করে দেয়া হলো। অর্ধাহারে, অনাহারে মুসলমানরা দীর্ঘ দিন কাটাল। গাছের পাতা আর পোড়া চামড়া খেয়ে ক্ষুধার জালা মেটাতে লাগল। কুরাইশদের উৎপীড়ন সীমার বাইরে চলে গেলে নবীজি (সা.) প্রিয় মাতৃভূমি ত্যাগে হিজরত করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু মদীনায় গিয়েও স্বস্তি পেলেন না। মুসলমানদের সমূলে ধ্বংস করতে কুরাইশগণ মদীনার ওপর চড়াও হলো। ফলে উহুদ আর খন্দকের ঐতিহাসিক যুদ্ধ ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই করে নিল। পৃথিবীর বুকে ইসলাম ও মুসলমানদের অস্তিত্ব তারা কিছুতে মেনে নিতে পারছিল না। চলতে থাকল হক বাতিলের লড়াই এভাবে কেটে গেল দীর্ঘ একুশটি বৎসর। ইসলামের প্রাণকেন্দ্র মক্কা নগরী তখনও কুফর-শিরকের অন্ধকারে নিমজ্জিত।

মক্কা অভিযানের কারণ :

ষষ্ঠ হিজরীতে সম্পাদিত হুদায়বিয়া সন্ধির ফলে কুরাইশ আর মুসলমানদের মাঝে যুদ্ধবিরতি চলতে থাকে। নির্যাতিত, নিপীড়িত আর দেশান্তরিত মুসলমানগণ কেউ হাবশায় কেউ মদীনায় আবার কেউ বাস্তুহারা অবস্থায় সমুদ্র উপকূলে ঈসের জঙ্গলে অবস্থান করে বিজয়ের প্রহর গুনছিল। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ফাতহে মুবিন তথা মুসলমানদের মহা বিজয়ের যে সুসংবাদ ঘোষিত হয়েছিল, কুরাইশদের আতংক থেকে মুক্তির সেই ক্ষণের দিকে চাতকের ন্যায় তাকিয়ে ছিল সকল নিগৃহীত মুসলিম। কিন্তু হুদাইবিয়ার সন্ধির ফলে আপাতদৃষ্টিতে সমাধানের কোনো পথ দেখা যাচ্ছিল না।

হঠাৎ কুরাইশদের পক্ষ থেকে সন্ধির শর্ত

ভঙ্গের দরুন মুসলমানদের হাতে মক্কা অভিযানের সুযোগ চলে আসে। ঘটনাটি ছিল এমন, মক্কা অঞ্চলের খুযা'আ গোত্র ছিল মুসলমানদের মিত্র। এর বিপরীত বনু বকর ছিল কুরাইশদের মিত্র। মক্কায় বাস করে মুসলমানদের সাথে খুযা'আ গোত্রের মিতালি কুরাইশগণ সহ্য করতে পারল না। বনু বকরের সাথে মিলে তারা খুযা'ঈদের আক্রমণ করে বসে। নির্মমভাবে তাদের বহু লোককে হত্যা করা হয়। এমনকি তাদের অনেকে কা'বাগৃহে আশ্রয় নিয়েও প্রাণ বাঁচাতে পারেনি। সাধারণত কা'বাগৃহের চতুর্সীমা হারাম শরীফের মধ্যে নরহত্যা নিষিদ্ধ মনে করা হতো। কিন্তু সেদিন কা'বাগৃহের এই মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে চরম ঔদ্ধতা প্রদর্শন করে তারা ঘোষণা করল কিছুক্ষণের জন্য মনে করে নাও যে, মহান আল্লাহ নেই। এভাবে পাষণ্ডগণ কা'বা প্রাঙ্গণে খুযা'আ গোত্রের মুসলমানদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করল। তাদের এই আচরণ ছিল হুদাইবিয়া সন্ধির খেলাফ।

ইতিমধ্যে নবীজি (সা.)-এর কাছে এই নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞের সংবাদ পৌঁছে গেল। খুযা'আ গোত্রে সরদার বুদায়েল চল্লিশ সদস্যের প্রতিনিধিদল নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমতে হাজির হয়ে সমস্ত ঘটনা শুনিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করল। এই নির্মম অত্যাচারের কাহিনী শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) যারপরনাই দুঃখিত হলেন। সন্ধি ভঙ্গের জন্যই যে কুরাইশগণ ইচ্ছাকৃতভাবে এই আক্রমণ করেছে তা বুঝতে বাকি রইল না। তথাপি শান্তির প্রতীক নবীজি (সা.) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযান না পাঠিয়ে প্রথমত দূত মারফত এই প্রস্তাব পাঠান যে, হে কুরাইশগণ! তোমরা খুযা'আ গোত্রকে উপযুক্ত অর্থদান করে কৃত অন্যায়ের প্রতিকার করো অথবা বনু বকরের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করো। অন্যথায় হুদাইবিয়ার সন্ধি বাতিল বলে ঘোষণা করো।

কুরাইশগণ হঠকারিতাস্বরূপ দূতকে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিল যে আমরা শেষ শর্তটি গ্রহণ করলাম অর্থাৎ সন্ধি বাতিল বলে ঘোষণা করলাম। দূত মদীনা শরীফে ফিরে এসে নবীজি (সা.) কে সব কথা জানালেন। যুদ্ধ ছাড়া আর কোনো উপায় বাকি রইল না।

কুরাইশগণ তাদের ভুল বুঝতে পেরে শঙ্কিত হয়ে পড়ল। পুনরায় সন্ধি স্থাপনের ফন্দি আঁটল। তাদের প্রসিদ্ধ সরদার আবু সুফিয়ানকে দূতরূপে মদীনায় প্রেরণ করল। কিন্তু তার মিশন ব্যর্থ হলো। পূর্বসন্ধি বহাল করা সম্ভব হলো না।

সমরায়োজন :

হুদাইবিয়ার সন্ধির ফলে মুসলমানরা নিরাপদে ধর্ম প্রচারের সুযোগ পাওয়ায় তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। বিশেষত হুদাইবিয়া থেকে ওমরা পালনেচ্ছুক মুসলমানদেরকে কুরাইশগণ অন্যায় জেদের বশবর্তী হয়ে আল্লাহর ঘর জিয়ারতে বাধা দিয়ে ফেরত পাঠানোর ঘটনায় সমগ্র আরব কুরাইশদের প্রতি বিতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। অপরদিকে মুসলমানদের এই কোমলতা দেখে সকলে ইসলামের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। পৌত্তলিকগণ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। ফলে সন্ধির পর মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা দ্বিগুণ অপেক্ষাও অধিক হয়ে যায়। কুরাইশদের প্রসিদ্ধ সেনাপতি খালিদ এবং আমর ইবনুল আ'সও এ সময়েই ইসলাম গ্রহণ করেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) মুসলমানদেরকে রণসজ্জার নির্দেশ দিলেন- সকল পরিকল্পনা গোপন রেখে সৈন্য সংগ্রহে মনোনিবেশ করলেন। মুসলমান গোত্রসমূহের মধ্যে ঘোষণা করে দিলেন- "যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে, সে যেন রমাজান মাসে মদীনায় উপস্থিত থাকে।" এই ঘোষণার ফলে আসলাম, গিফার, মুযায়না, আশজ, জুহায়না প্রভৃতি গোত্রের বহুসংখ্যক সৈন্য এসে মদীনায় সমবেত হলো।

কঠোর গোপনীয়তা :

শত্রুর কাছে নিজেদের অবস্থান গোপন রাখা যুদ্ধের অন্যতম প্রধান কৌশল। এ ক্ষেত্রেও নবীজি (সা.)-এর আদর্শ অবিস্মরণীয়। মদীনায় রণসজ্জা চলছে ঠিকই কিন্তু কেউ জানে না গন্তব্য কোথায়। এ ব্যাপারে সকল পরিকল্পনা নবীজি (সা.) নিজের মাঝেই সীমাবদ্ধ রেখে ছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) তার কন্যা উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) কে জিজ্ঞেস করলেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) কার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবেন, তা তুমি বলতে পারো কি? তিনি বললেন, আমি তা জানি না। বোঝা গেল, নিজের সহধর্মিণীর কাছেও বিষয়টি গোপন রাখা হয়েছিল।

অভিযান গোপন রাখতে বাহ্যিক সকল উপকরণ অবলম্বনের পাশাপাশি নবীজি (সা.) আল্লাহর দরবারেও প্রার্থনা করলেন- হে আল্লাহ! আমরা কুরাইশদের দেশে গিয়ে হঠাৎ তাদের সম্মুখে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকট যুদ্ধবার্তা এবং গুপ্তচর পৌঁছতে দিওনা। নবীজির (সা.) এ দু'আ কবুল হলো এবং একজন গুপ্তচর পত্র মারফত কুরাইশদের সংবাদ পৌঁছাতে গিয়ে 'রওযাতুখাখ' নামক স্থানে ধরা পড়ল।

এভাবে শত্রুকে অপ্রস্তুত রেখে আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল শত্রুদের প্রাণরক্ষা এবং পবিত্র কা'বাগৃহের প্রাঙ্গণে রক্তারক্তি কাণ্ড পরিহার করা। এটাও নবীজি

(সা.)-এর দূরদর্শিতা ও দয়ার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

মক্কা যাত্রা :

অষ্টম হিজরীর ১০ রমাজান রাসূলুল্লাহ (সা.) দশ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী সঙ্গে নিয়ে মদীনা হতে যাত্রা আরম্ভ করেন। সকলেই রোযা রেখেছিলেন। কদীদ নামক স্থানে পৌঁছে সকলে রোযা ভেঙে ফেলেন। কাফেলা অগ্রসর হতে লাগল। 'আবওয়া' নামক স্থানে নবীজি (সা.)-এর চাচাত ভাই ও দুধভাই আবু সুফিয়ান এবং ফুফাতো ভাই আব্দুল্লাহ ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে তাঁর খেদমতে হাজির হলো। একসময় ওরা ছিল নবীজির (সা.) প্রাণের শত্রু। আবু সুফিয়ান ছিল খ্যাতনামা কবি। সে সর্বদা নবীজির (সা.) কুৎসা রটনায় কবিতা রচনা করে হাটে-বাজারে, সভা-সমিতিতে আবৃত্তি করে তৃপ্তি পেত। দীর্ঘ একুশ বছর পর আজ তাদের ভুল ভেঙেছে।

তাদের অমানুষিক অসদ্ব্যবহারের দরুন নবীজি (সা.) তাদের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন, তাই সাক্ষাৎ দিতে চাইলেন না। নিরূপায় হয়ে তারা বিভিন্ন আত্মীয়স্বজনের কাছে সুপারিশের জন্য ধরনা দিলেন। হযরত আলী (রা.) পরামর্শ দিলেন- তোমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সম্মুখে হাজির হয়ে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতাদের কথা পুনরোক্ত করে বল আমরা অপরাধী। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে জয়ী করেছেন। এখন আপনার যা ইচ্ছা তাই করুন। যেই কথা সেই কাজ। তারা এই পন্থাই অবলম্বন করল। এবার আর দয়ার সাগর নবীজি (সা.) দয়ার্ত না হয়ে পারলেন না। তিনিও হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ন্যায় বলে উঠলেন। আজ তোমাদের প্রতি কোনো প্রকার অনুযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনি সমস্ত দয়ালু অপেক্ষা অধিক দয়ালু। অতঃপর উভয়ে খাঁটি নবীভক্ত হিসেবে পরিণত হলেন।

সর্বশেষ মুহাজির :

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রিয় চাচা হযরত আব্বাস (রা.) বদর যুদ্ধের পরেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এ যাবৎ তিনি পবিত্র কা'বাগৃহের সিকায়া তথা পানি পান করানোর মতো মর্যাদাপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে মক্কাতেই অবস্থান করে আসছিলেন এবং কুরাইশদের গতিবিধির প্রতি দৃষ্টি রেখে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে যাবতীয় বিষয়ের সংবাদ আদান-প্রদান করছিলেন। আজ কেন জানি তার প্রাণে নবীপ্রেমের তীব্র আকর্ষণ জেগে উঠল। তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। নবীজির (সা.) দর্শনে ব্যাকুল হয়ে সকল মাল ও স্ত্রী-পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে মক্কা হতে হিজরত করে মদীনাভিমুখে যাত্রা করলেন। মক্কার কুরাইশদের কাছে অভিযানের খবর আল্লাহ তা'আলা তখনও গোপন রেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) সৈন্য সামন্ত নিয়ে 'জুহফা' নামক স্থানে পৌঁছে প্রিয়তম চাচা হযরত আব্বাস (রা.)-এর সাক্ষাৎ পেলেন। মুহাজির চাচাকে দেখে তাঁর সর্বান্তঃকরণ আনন্দ পরিপ্লুত হয়ে উঠল। তিনি বললেন- শ্রদ্ধেয় চাচাজান, আমি যেমন সর্বশেষ নবী, আপনিও তদ্রূপ সর্বশেষ মুহাজির।

সরদার আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণ :

কুরাইশ সরদার আবু সুফিয়ান সকলের পরিচিত। ইসলামকে সমূলে ধ্বংস করাই ছিল যার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। জীবনভর সে কত ষড়যন্ত্র করল, তার প্ররোচনায় কত ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ সংঘটিত হলো, উহুদ যুদ্ধে তার নেতৃত্বে সত্তর জন মুসলমানকে শহীদ করা হলো। কিন্তু তার কলুষিত অন্তরও যে একদিন ঈমানের নূরে উদ্ভাসিত হবে তা কে জানত? আদর্শ মানব মহানবী (সা.)-এর মমতায় আঁকা যুদ্ধ নকশার ফলেই এ দৃশ্য পৃথিবী দেখতে পেয়েছিল।

রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বসৈন্যে মক্কার উপকণ্ঠে 'মররুয-যহরান' নামক স্থানে পৌঁছে শিবির সন্নিবেশ করলেন। ক্লান্ত সৈন্যগণ আরাম করার জন্যে নির্দেশ মতে প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক তাবু টানালেন এবং প্রত্যেক তাবুর সম্মুখে প্রথানুযায়ী অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করলেন। স্বতন্ত্রভাবে দশ হাজার স্থানে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হওয়ার ফলে বিশাল মররুযযহরান প্রান্তর রাতের অন্ধকারে এক অপূর্ব দৃশ্য ধারণ করল।

মুসলিম বাহিনী যে মক্কার এত নিকটে পৌঁছে গেছে মক্কাবাসীগণ তা মোটেই জানতে পারেনি। তারা শুধু মদীনা থেকে যাত্রার কিছু আভাস পেয়েছিল। সুতরাং তথ্য সংগ্রহের জন্য কুরাইশগণ আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে তিন সদস্যের ছোট দল পাঠাল। তারা রাতের আঁধারে মররুযযহরানের অপরূপ দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। কিন্তু কারা এখানে অবস্থান করছে তা ঠিক করতে পারল না। অন্ধকারে ফিস ফিস করে পরস্পর বিভিন্ন মন্তব্য করতে লাগল। ইতিমধ্যে হযরত আব্বাস (রা.) তাদের আওয়াজ শুনে আবু সুফিয়ানকে চিনে ফেলল। নিকটে গিয়ে তাদেরকে মুসলিম বাহিনী আগমনের সংবাদ দিয়ে নবীজি (সা.)-এর কাছে আত্মসমর্পণ করার পরামর্শ দিলেন। সরদার আবু সুফিয়ান হযরত আব্বাস (রা.)-এর নিরাপত্তায় নবীজির (সা.) দরবারে হাজির হলো। নবীজি (সা.) পেছনের সব কথা ভুলে গিয়ে করুণ মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন- আবু সুফিয়ান এখনও কি তোমার ভুল ভাঙেনি? আল্লাহ তা'আলা ছাড়া বন্দেগির যোগ্য অন্য কেহ নেই, একথা কি তুমি এখনও বুঝতে পারনি?

আবু সুফিয়ানের হৃদয় বিগলিত হলো, সত্য তার সামনে উদ্ভাসিত হলো। এক কথায়ই সে ইসলাম গ্রহণ করে নিল।

নালিশ ও পদচ্যুতি :

হযরত আব্বাস (রা.) এবার হযরত আবু সুফিয়ান (রা.) কে সঙ্গে নিয়ে মুসলিম বাহিনীর শান-শওকত দেখাতে লাগলেন। একের পর এক বাহিনী পতাকা দিয়ে তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল আর তারা এ দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত ও বিস্মিত হতে লাগলেন। আনসারদের বাহিনী অতিক্রম কালে পতাকাধারী আনসার নেতা হযরত সা'আদ ইবনে উবাদা (রা.) হযরত আবু সুফিয়ান (রা.) কে দেখে বলে উঠলেন। আজ ভীষণ সংঘর্ষের দিন। আজ কা'বা প্রাঙ্গণে হত্যাকাণ্ড বৈধ বলে বিবেচিত হবে। আবু সুফিয়ান (রা.) এ কথা শুনে নবীজি (সা.)-এর কাছে গিয়ে আর্তনাদ করে উঠলেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা). আজ কি আপনি কুরাইশকে ধ্বংস করে ফেলবেন? পবিত্র কা'বার মর্যাদা কি আজ ক্ষুণ্ন করা হবে? সা'আদ ইবনে উবাদা কী বলছে শুনুন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) অভয় দিয়ে বললেন, সা'আদের কথা সত্য নয়। আজ পবিত্র কা'বার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দিন। কোনো ভয় নেই আবু সুফিয়ান, আজ প্রেম ও করুণার দিন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত সা'আদকে পদচ্যুত করে তার হাতের পতাকা তার পুত্র হযরত কায়সের হাতে দিলেন। এই ছিল মহানবীর (সা.) মহানুভবতার দৃষ্টান্ত। কুরাইশদেরকে অভয় প্রদানের উদ্দেশ্যে শান্তির বিপরিত উক্তিকারী নিজ দলের লোককে পদচ্যুত করা হলো।

নিরাপত্তার বার্তা প্রেরণ :

রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আবু সুফিয়ানকে (রা.) বললেন-তুমি মক্কায় গিয়ে আমার পক্ষ হতে শহরময় ঘোষণা করে দাও যে কেউ অস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক মুসলমানদের নিকট আত্মসমর্পণ করবে, যে কেউ আবু সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে, যে কেউ কা'বা গৃহে প্রবেশ করবে, যে কেউ আপন গৃহের দরজা বন্ধ করে রাখবে তাকে আমি নিরাপত্তা দান করলাম।

এ কথা ঘোষণা হওয়ার সাথে সাথে শহরজুড়ে ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেল। যে যেদিকে পারল গিয়ে আশ্রয় নিল। তাদের মাথায় যেন আজ আকাশ ভেঙে পড়ল। বিনা মেঘে বজ্রপাতের ন্যায় কাণ্ড ঘটে গেল। যারা ছিল একসময় দুর্ধর্ষ, অপ্রতিরোধ্য যোদ্ধা। আজ তারা প্রতিরোধের প্রস্তুতি নেয়ারও সুযোগ পেল না। জান বাচাতেই আজ সকলে ব্যস্ত। এমন রণকৌশল অবলম্বনকারী কোনো সেনাপতির সন্ধান ইতিহাসে মেলা ভার।

নগরে প্রবেশ :

রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কা নগরে প্রবেশের দুটি পথ দিয়েই সৈন্য প্রবেশ করানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি বাহিনীকে মক্কার নিচু পথে নগরে প্রবেশের নির্দেশ দিলেন। অবশিষ্ট বাহিনী নিয়ে স্বয়ং মক্কার উঁচু পথ ধরে নগরে প্রবেশ করলেন। বিনা বাধায় তিনি 'হাজুন' নামক স্থানে পৌছে বিজয় পতাকা পোতার নির্দেশ দিলেন। মক্কার কুরাইশগণ আজ নিরাপত্তা লাভ করে জান বাচাতে ব্যস্ত, কেউ কোনো প্রতিরোধ করতে সাহস করল না। তবে কতেক দুঃস্কৃতকারী কুরাইশ যুবক হযরত খালিদ (রা.)-এর বাহিনীর দুই সদস্যকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পেয়ে শহীদ করে দেয়। সংবাদ পেয়ে হযরত খালিদ (রা.) পাল্টা আক্রমণ করলে তাদের বারো জন নিহত হয়। বাকিরা পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়।

কা'বাগৃহে প্রবেশ :

যে স্থানে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পতাকা পোঁতা হয় সে স্থানেই পরবর্তীতে মসজিদে ফতহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্রামের পর তিনি কা'বার চতুর্দিকে সাতবার তাওয়াফ করলেন। শিরক কুফরের সকল নিদর্শন দূর করে কা'বা প্রাঙ্গণকে পবিত্র করলেন। অতঃপর কা'বাগৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে অন্ধকার যুগের সকল কলুষমুক্ত করে তথায় নামায আদায় করত তাওহীদের কালিমা উচ্চারণ করলেন।

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা :

মক্কার অধিবাসীগণ ভয়ে, অভিমানে এবং অনুতাপে একেবারে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল। পবিত্র ইসলামের মূলোৎপাটনে যারা নেতৃত্বভার গ্রহণ করেছিল। অশ্লীল ভাষায় রাসূলুল্লাহ (সা.) কে অজস্র গালাগালি করত। মুক্ত কৃপাণ, শাণিত বাণ ও বিষাক্ত বর্শা হাতে তাকে হত্যা করতে ওত পেতে থাকত, তাবলীগ করতে বেরোলে যারা থুতু বা প্রস্তর লোষ্ট্র নিক্ষেপ করত, তাঁর দেহ মুবারক থেকে পবিত্র রক্ত ঝরাত, নামাযে নাড়িভুঁড়ি চাপা দিত, বয়কট করে খুত পিপাসায় কষ্ট দিত, প্রিয় মাতৃভূমি থেকে হিজরতে যারা বাধ্য করেছিল, যাদের প্রবল আক্রমণে সুদূর মদীনার শহর প্রাচীর পর্যন্ত থর থর করে কেঁপে উঠত, আজ তারা সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দলে দলে কা'বা প্রাঙ্গণে সমবেত হলো। আজ তাদের সেই দর্প, গর্ব ও আস্ফালন কোনো কিছুই নেই। দশ হাজার মুসলিম বাহিনী দ্বারা বেষ্টিত হয়ে আজ তারা শেয়ালের ন্যায় লেজ গুটিয়ে দুরু দুরু বুকে চেয়ে আছে দয়ার সাগর মহানবীর (সা.) ফয়সালার দিকে।

এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) কা'বাগৃহ হতে বের হয়ে আসলেন এবং দরজার

উভয় পাশের কপাটে হাত রেখে এক নাতিদীর্ঘ হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, এক আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য অন্য কেউ নেই। তিনি স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন, স্বীয় বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই সকল দলকে পরাস্ত করেছেন। ঐতিহাসিক এই বক্তৃতার মাঝে তিনি মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও সংক্ষেপে জরুরি কিছু বিধান ঘোষণার পর সকলের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে বলেন- আজ তোমাদের প্রতি কোনো অভিযোগ নেই। যাও, তোমাদেরকে মুক্তি প্রদান করলাম, তোমরা স্বাধীন।

নবীজি (সা.)-এর অপূর্ব করুণা দেখে ভীতসন্ত্রস্ত মক্কাবাসীরা অভিভূত হয়ে পড়ল। সজল নয়নে নির্বাক বদনে মহামানবের মুখ পানে তাকিয়ে রইল। এমনও কি হতে পারে? জীবনভর যাকে শত্রু ভেবেছে তাঁর এই বাদান্যতা করুণা আর কোমলতা দেখে কৃতজ্ঞতাভিভূত বহু কুরাইশ নরনারী নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে নবীজির (সা.) চরণতলে নিজেকে সঁপে দিয়ে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করতে থাকে–লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)। এ সময় যারা ইসলাম গ্রহণ করেন হযরত আবু বকর (রা.)-এর পিতা হযরত আবু কুহাফা (রা.) তাদের অন্যতম। তাঁর ইসলাম গ্রহণে নবীজি (সা.) যারপরনাই আনন্দিত হয়েছিলেন।

উহুদযুদ্ধে নবীজির (সা.) প্রাণপ্রিয় চাচা আমীর হামযা (রা.) কে শহীদ করেছিল ওয়াহশী আর তার বুক চিরে কলিজা ও হৃৎপিণ্ড বের করে চর্বন করেছিল সরদার আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা। প্রিয় চাচার ছিন্ন ভিন্ন দেহ দেখে নবীজি (সা.) সেদিন অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন। আজ সেই কুখ্যাত ওয়াহশী আর হিন্দাও দয়ার আঁচলে আশ্রয়লাভে ধন্য হলো। অতীত জীবনের ভুল বুঝতে পেরে উভয়ে তাওবা করে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করলেন। নবীজি (সা.)ও ক্ষমা করে বাই'আত করে নিলেন। এই সাধারণ ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হয় শুধু চার নরাধম। অমার্জনীয় অপরাধের ফলে তাদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।

কা'বাগৃহের চাবি হস্তান্তর :

হিজরতের পূর্বে মক্কায় থাকাকালীন একবার নবীজি (সা.) কা'বাগৃহে প্রবেশের ইচ্ছা করলেন। চাবির রক্ষক ছিলেন উসমান ইবনে তলহা। তিনি প্রথানুসারে সোমবার ও বৃহস্পতিবার কা'বাগৃহের দরজা খুলতেন। ভিন্ন দিনে দরজা খোলার অনুরোধ করায় সে নবীজি (সা.) কে অতি কর্কশ ভাষায় নিষেধ করে দিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন–শোন উসমান, একদিন এই ক্ষমতা আমার হাতে আসবে। তখন আমি যাকে ইচ্ছা চাবির রক্ষক বানাব। উসমান বললেন, সে দিন কি সমস্ত কুরাইশ ধ্বংস হয়ে যাবে? নবীজি (সা.) বললেন, না ধ্বংস হবে না। সে দিনই হবে কুরাইশদের প্রকৃত মর্যাদার দিন।

আজ সেই দিন সমাগত। চাবি রক্ষণের গুরু দায়িত্ব নিতে আগ্রহী হযরত আলী (রা.) হযরত আব্বাস (রা.)সহ প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম। নবীজি (সা.) পূর্বের সেই ঘটনা ভোলেননি। আজ তার প্রতিশোধ নেয়ার মোক্ষম সুযোগ ছিল। কিন্তু তিনি উদারতা দেখালেন। নিজ গোত্রের প্রার্থীদেরকে চাবি না দিয়ে সেই উসমান ইবনে তালহাকেই ডেকে পাঠালেন। তার হাতে চাবি অর্পণ করে বললেন- নাও, এই চাবি তোমাদের দান করলাম। কা'বাগৃহের চাবি চিরদিন তোমাদের হাতেই থাকবে। তোমাদের কাছ থেকে এই ক্ষমতা যে ছিনিয়ে নেবে সে যালিম। নবীজি (সা.) তাকে পূর্বের ওই ঘটনাও স্মরণ করিয়ে দিলেন। উসমান নবীজির (সা.) এই চরিত্র মাধুর্য দেখে ইসলাম গ্রহণ করে ফেলল। অদ্যাবধি এই ক্ষমতা তার বংশধরগণের মধ্যেই আছে। হযরত উসমানের (রা.) পুত্র শায়বার নামানুসারে বর্তমানে তারা শায়বী নামে পরিচিত।

মক্কা বিজয়ের মধ্য দিয়ে চিরদিনের জন্য মিথ্যার ওপর সত্যের জয় হলো, অন্ধকারের ওপর আলোর জয় হলো। কা'বাগৃহ হলো কুফর শিরকমুক্ত মিল্লাতে ইবরাহীমের ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রমাণিত হলো ইসলাম তলোয়ারে নয় উদারতায়। আর ইতিহাসে ঠাঁই করে নিল এক আদর্শ বিজেতার পরম অনুকম্পা।

চশমার জগতে যুগ যুগ ধরে বিখ্যাত ও বিশ্বস্ত

মেহবুব অপটিক্যাল কোং

এখানে অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে চক্ষু পরীক্ষা করা হয়।
পাইকারি ও খুচরা দেশি-বিদেশি চশমা সুলভ মূল্যে বিক্রি করা হয়।

১২ পাটুয়াটুলি রোড, ঢাকা ১১০০
ফোন : ০২- ৭১১৫৩৮০ , ০২- ৭১১৯৯১১

১৩ গ্রীন সুপার মার্কেট, গ্রীন রোড,
ঢাকা-১২১৫। ফোন : ০২-৯১১৩৮৫১

নবী (সা.)-এর অনুসরণের সঠিক পন্থা পূর্বপুরুষদের অনুকরণ

মাওঃ উবাইদুর রহমান খান নদভী

আজ এই মুহূর্তে আপনি ইসলাম গ্রহণ করলেন কিংবা আপনি জন্মগতভাবেই মুসলিম, এ মুহূর্তে আপনি ইসলামের কোনো বিধান পালন করতে চান, তো আপনাকে আলেম-উলামা বা ইসলাম সম্পর্কে জানেন–এমন ব্যক্তির শরণাপন্ন হতে হবে। আমাদের এই ভূখণ্ডে প্রথম দিকে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তারা ঈমান শিখেছিলেন ইসলাম-প্রচারকদের কাছে। এরপর তাদের কাছেই নামায আদায় করতে শিখেছিলেন। আজ এবং অনাগত দিনেও পৃথিবীব্যাপী প্রতিটি নওমুসলিমই ঈমান, অযু-গোসল, হালাল-হারাম, সালাত-যাকাত, সিয়াম-হজ্ব ইত্যাদির প্রথম ধারণা লাভ করবেন তার ইসলাম গ্রহণের প্রথম মাধ্যম ব্যক্তিটির কাছ থেকে এবং বহু কিছু তিনি শিখে নেবেন মুসলিমসমাজের ধর্মীয় কার্যক্রম ও কালচার থেকে। এ বিষয়টি আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারব যদি কল্পনা করি সে সময়টির কথা, যখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এত উন্নত হয়নি। শিক্ষা-দীক্ষার হার ছিল প্রায় শূন্যের কোঠায়। তথ্য ও যোগাযোগমাধ্যম বলতে তেমন কিছুই ছিল না। ছিল না এত বই-পুস্তক, পত্রিকা ও প্রকাশনা। তখন ভাবের আদান-প্রদান ও যোগাযোগের একটিই উপায় ছিল। তা হলো মৌখিক জ্ঞান বিনিময়ের পাশাপাশি বাস্তব অনুশীলন। অর্থাৎ হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া।

আজকের এই সময়টা নিয়েই ভাবুন। দেখবেন, বাংলাদেশের মুসলমানরা ইসলামী বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, ইবাদত-বন্দেগী, সুন্নত-বিদআত, জায়েয-নাজায়েয, হালাল-হারাম প্রভৃতি যা কিছুই জানেন এর সিংহভাগই সমাজ, পরিবেশ, গৃহশিক্ষক, মসজিদের ইমাম, ওয়ায়েজ, মক্তবের উস্তাদ, মা-বাবা, দাদা-দাদি ইত্যাদি থেকে শেখা। কেবল নিজের পড়াশোনা, প্রচারমাধ্যম বা অন্যান্য ব্যক্তিগত অনুসন্ধান থেকে ধর্মীয় জ্ঞান লাভ করেছেন এমন মানুষের সংখ্যা এ দেশে এখনও অনেক কম।

আমাদের সমাজের প্রকট বাস্তবতার আলোকেই এ দেশের মুসলমানের প্রথম ইসলামী জ্ঞান অর্জনের এ ব্যবস্থাকে অবলম্বন করেই প্রবচন চালু হয়েছে- 'শুইন্যা মুসলমান।' অর্থাৎ মূল উৎস ঘেঁটে, দেখে বা পড়ে নয়, শুনে শুনে যারা একটি বিশ্বাস ও সংস্কৃতিকে ধারণ করেছে এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রেই এ প্রবচনটি প্রয়োগ করে থাকেন গ্রাম-বাংলার মানুষ।

কেবল বই-পুস্তক পড়ে একটা কাজ শেখা আর একজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে হাতে-কলমে শিক্ষালাভ করার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত আছে। কোনো খেলা, ব্যায়াম, সাইকেল বা গাড়ি চালানো কোনোটাই শুধু বই-পুস্তক পড়ে, মিডিয়াতে ছবি দেখে পূর্ণরূপে শিখে নেওয়া সহজ নয়। একজন উস্তাদের সাথে থেকে তার ইনস্ট্রাকশন মেনে বিষয়টি শিখলে এবং হাতে-কলমে অনুশীলন করলে পুঁথিগত জ্ঞান বা তাত্ত্বিক ব্যাকরণ ততটা না জানলেও কাঙ্ক্ষিত কার্যক্রমটুকু শিখে নেওয়া সম্ভব। পড়াশোনার বিষয়টি ব্যবহারিক পর্যায়ে থাকলেও কাজ বাধাগ্রস্ত হবে না। গভীর তত্ত্ব আলোচনা ও সামগ্রিক জ্ঞান অনুসন্ধান বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের জন্য জরুরি হলেও বিশ্বাস, দর্শন ও জীবনব্যবস্থার সাধারণ অনুসারীর প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ওই প্রশিক্ষক, গুরু, পীর, উস্তাদ, মুর্শিদ, আলেম, ইমাম বা প্রচারকের সান্নিধ্যই যথেষ্ট।

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম ও আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দ্বীন ইসলামের প্রচার তত্ত্বের চেয়ে ব্যবহারিক পর্যায়েই বেশি অগ্রসর হয়েছে। কেননা, পৃথিবীর সকল অঞ্চলের সকল যোগ্যতার মানুষকে তাওহীদ, রিসালত ও আখেরাতের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত জীবনব্যবস্থার দিকে দাওয়াত দিতে চাইলে কোনো কঠিন ও জটিল পন্থা অবলম্বন করা চলবে না। হযরত নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর সরল ও সনাতন পন্থায়ই তা করতে হবে।

হযরত নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবায়ে কেরামকে জীবনের প্রতিটি বিষয় হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়েছেন, কোনো বই-পুস্তক ধরিয়ে দিয়ে গবেষণা করে বুঝে নিতে বলেই দায়িত্ব শেষ করেননি। পৃথিবীর অপরাপর এলাকায় বসবাসরত সমকালীন মানুষ এবং পরবর্তী সকল যুগের অনাগত বিশ্বমানবমণ্ডলীর কাছে নিজের দাওয়াত পৌঁছে দিতেও হযরত বই-পুস্তক, পত্রপত্রিকা, পাণ্ডুলিপি ইত্যাদির আশ্রয় নেননি। তিনি তাঁর সাহাবীগণকে দায়িত্ব দিয়েছেন বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ো এবং আমার আদর্শের একটি বাণী হলেও পূর্ব-পশ্চিমে বসবাসরত প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে

দাও।

হযরত নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেমন বলতেন, তোমরা আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখো সেভাবে নামায পড়ো, সাহাবীরা যেমন নতুন কোনো মানুষকে অযু শেখানোর সময় তাদের সামনে বসে অযু করতেন এবং বলতেন, এই ছিল নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অযু। ইসলামের প্রতিটি বিধানই প্রাথমিকভাবে এর ধারক-বাহকদের মাধ্যমে ব্যবহারিক তথা প্রায়োগিকভাবেই বিস্তৃত ও প্রচলিত হয়েছে। আর ইসলামের সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বা এর অন্তর্নিহিত শক্তিও এখানেই যে, এটি ধারণ বা পালন না করে বহন করা যায় না। আর একে ভালো না বেসে ধারণও করা যায় না। যারা একে ভালোবাসেন ও নিজেরা ধারণ করেন, তারাই কেবল একে অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারেন। এর আনুষ্ঠানিক প্রচারের তুলনায় এর ধারক ও সেবকদের আন্তরিকতা ও কল্যাণকামিতার মাধ্যমেই ইসলাম অধিক, ব্যাপক, গভীর আর টেকসই পর্যায়ে বিস্তৃত হয়েছে। দেড় হাজার বছরের ইতিহাসই এর সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট।

এখন ইসলামের একজন অনুসারী হিসেবে আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তা করি। ইসলামের একজন প্রচারক যখন আমার কাছে ইসলামের আদর্শ তুলে ধরবেন, সে সময়টা যদি হয় আরো ২, ৪, ৫, ৭ শ বছর আগের, তখন কি তার পক্ষে সম্ভব আমার হাতে এক কপি কুরআন বা সহীহ হাদীসের একটি পূর্ণাঙ্গ সংকলন তুলে দেওয়া বাংলাভাষী হওয়ায় আমার পক্ষে কি আরবী ভাষায় তা পাঠ করাও সম্ভব? শুধু আরবী ভাষা বলেই কথা নয়, আমার পক্ষে কি তাত্ত্বিক এ দুটো উৎস-বিদ্যার বিষয়গত ভাব উদ্ধার করাও সম্ভব? এখানে আমার জ্ঞান-গরিমার পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক অবস্থা, বোধ-বিবেকের পরিমাণও একটি প্রশ্ন। এরপর বহু সাধনা করে কুরআন-সুন্নাহর ভাণ্ডার হাতে পেয়ে গবেষণা করে এর সারনির্যাস হাসিল করে নিজে ঈমান, আমল ও আখলাক চর্চা শুরু করতে আমার কত মাস, বছর বা যুগ লাগবে সেটাও কি কম বড় প্রশ্ন? এতটা পরিশ্রম করে যদি ইসলাম পালন আমি শুরু করি, তাহলেও তো ভালো। কিন্তু এ কাজটুকু ক'জন মানুষের পক্ষে সহজ বা সম্ভব? তদুপরি প্রশ্ন দেখা দেবে যে, কুরআন-সুন্নাহ গবেষণা করে ঈমান-আমল, নামায-রোযা, হজ্ব-যাকাত, বিয়ে-শাদি, ব্যবসা-বাণিজ্য, ঋণ-উৎপাদন, দান-খয়রাত, জীবন-মৃত্যু, জানাযা-উত্তরাধিকার ইত্যাদি শুরু করার আগ পর্যন্ত আমার মুসলমানিত্বের এ দীর্ঘ সময়ের নামায-বন্দেগী ও কাজকর্মে কী হবে?

আমার তো মনে হয়, কোনো ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীর ঈমান ও আমলের জন্য, ইসলামী জীবনবোধ ও সংস্কৃতি চর্চার জন্য প্রথম দিনই কুরআন ও সুন্নাহ গবেষণা শুরু করার পদ্ধতি ইসলামের স্বাভাবিক রীতি নয়। যদি এই না হবে তাহলে আমার সন্তানকে আমি ঈমান শেখাব কী করে? তাকে নামায, যিকির, সবর, শোকর, তাওয়াক্কুল ও আদব-আখলাক আমি কোন অধিকারে শিক্ষা দেব? যদি সে প্রশ্ন তোলে, আব্বু! তুমি আমাকে কুরআন ও সুন্নাহ শেখাও কেন? কুরআন-সুন্নাহ থেকে আমিই আমার জীবনবিধান খুঁজে নেব। তুমি এর মধ্যে এসো না। তুমি তোমার প্রায়োগিক আচরণ ও পর্যবেক্ষণ আমার ওপর চাপাতে চেষ্টা করো না। আমি তোমার বা তোমাদের মাযহাব মানি না। আমার দায়িত্ব তো কুরআন-সুন্নাহর ওপর আমল করা। অতএব কুরআন-সুন্নাহর ওপর দখল স্থাপন করার সময় আমাকে দাও। এর পরই আমি শরীয়তের ওপর আমল শুরু করব। পুত্রের এসব যুক্তির পর আমার বলার কি কিছু থাকবে?

পুত্রের এ বক্তব্য যে ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত সে ভিত্তিই আমাকে কথা বলার সুযোগ দেবে। কারণ মহান আল্লাহ তাঁর দ্বীনের প্রচার ও শিক্ষাকে যে সনাতন ও স্বাভাবিক পদ্ধতিতে প্রচলিত ও বিস্তৃত করেছেন, এর সম্পূর্ণ অনুরূপ হচ্ছে আমার এ উদ্যোগ।

আমার পুত্রকে ইসলামী জীবনবিধান শিক্ষা দেওয়া আমার ওপর শরীয়তের নির্দেশ। আমি তাকে আল্লাহর পরিচয়, আল্লাহর শক্তি, প্রীতি, ভীতি ও ভালোবাসা শেখাব। তাকে হযরত রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মহত্ত্ব, অবস্থান ও অপরিহার্যতা সম্পর্কে ধারণা দেব। তাকে নামায শেখাব। খাওয়া-পরা, ঘুম-বিশ্রাম, প্রস্রাব-পায়খানা, প্রবেশ-প্রস্থান, মসজিদে যাতায়াত, আযানের জবাব, হাঁটাচলা, সালাম, মোসাফাহা ইত্যাদির ইসলামী নিয়ম শিক্ষা দেব। আমি নিজেও অযু-গোসল, রোযা-নামায, দাম্পত্য জীবন, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন, হজ্ব-কুরবানী প্রভৃতি যথাযথ নিয়মে পালন করব। অথচ আমি কুরআন বা হাদীস পড়ার বা বোঝার মতো যোগ্যতা রাখি না। জ্ঞানের এ দুই মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়ে আমার দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় বিধিবিধান হস্তগত করে আমল করার মতো শিক্ষা, মেধা,

মানসিক যোগ্যতা বা সামগ্রিক অবস্থা আমার নেই, এমতাবস্থায় আমার কী করণীয়?

আমার তো মনে হয়, এখানে আমার ও আমার পুত্রের একই ধরনের করণীয়, যা ইসলামের ১৫০ কোটি সমসাময়িক অনুসারীর প্রত্যেকেরই করণীয়। আর তা হলো, কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমা-কিয়াস থেকে গৃহীত ইসলামী বিধিবিধানের প্রয়োগিক রূপ ফিকহের অনুসরণ। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেমন বলেছেন, একজন ফকীহ শয়তানের মোকাবিলায় এক হাজার আবেদের চেয়েও শক্তিশালী। এর কারণ সম্ভবত এটিও যে, এক হাজার সাধারণ মুসলিমকে ধর্মীয় বিষয়াদি নিয়ে সংশয়ে উদ্বেগ ও বিভ্রান্তিতে ফেলে দেওয়া শয়তানের জন্য যত না কঠিন একজনমাত্র শরীয়ত-বিশেষজ্ঞ ফকীহ আলেমকে বিভ্রান্ত করা এর চেয়ে বেশি কঠিন। কেননা, এই ব্যক্তির কাছে কুরআন ও সুন্নাহর শক্তিশালী সম্পদ রয়েছে। রয়েছে ইলমে দ্বীনের আরও বিস্তারিত ভাণ্ডার।

কুরআন মজীদেও আল্লাহ তা'আলা এ মর্মে বলেছেন, প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর মধ্য হতে একদল মানুষ যেন দ্বীনি ইলমের ওপর ব্যুৎপত্তি অর্জন করে, কারণ জনগোষ্ঠীর বাকি অংশটিকে তাদের শরীয়তের ওপর পরিচালনা করতে হবে। এখানেও আমরা ফকীহ বা শরীয়তের আলেমের বিধিগত অস্তিত্ব এবং তাঁর কুরআনী দায়িত্ব উপলব্ধি করতে পারি।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও মহামান্য সাহাবীগণের পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার পর ইসলাম যখন আরব-উপদ্বীপ ছেড়ে একদিকে সাহারা গোবি ছুঁয়ে দূর অতলান্তিক স্পর্শ করছিল, অপরদিকে আসমুদ্র সাইবেরিয়া আর মহাচীনের প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছিল তখনও কিন্তু পবিত্র কুরআন ব্যাপকভাবে হস্তলিখিত হয়ে এত বিপুল পরিমাণ অনুলিপি তৈরি হয়নি, যা প্রতিটি শিক্ষিত নওমুসলিমের হাতে তুলে দেওয়া যায়। আর হাদীস শরীফ তো তখনও যাচাই-বাছাইয়ের পর সংকলিত ও গ্রন্থবদ্ধ হয়েও শেষ হয়নি। তো ইসলামের এ অগ্রযাত্রা, ইসলামী শরীয়তের আলোয় প্লাবিত এ নতুন পৃথিবীর বুকে কাদের মাধ্যমে কুরআন-সুন্নাহর আলো প্রতিবিম্বিত হয়েছিল? এর ছোট এক টুকরো জবাবই ইসলামের ইতিহাসে সুরক্ষিত আছে, যা আমি এ লেখার শুরুতে নিবেদন করেছি। হাদীস শরীফে তো বলা হয়েছে, তোমাদের মাঝে দুটি বিষয় আমি রেখে গেলাম। যতদিন তোমরা এ দুটো আঁকড়ে রাখবে, তত দিন পথচ্যুত হবে না। এক. আল্লাহর কিতাব। দুই. আমার আদর্শ। এ মহা দিকনির্দেশনার আরো সুসংহত রূপ হচ্ছে হযরতের অপর বাণী, যেখানে মুসলিম জাতিকে সত্যপথের দিশা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'যে আদর্শের ওপর আমি রয়েছি আর আমার সাহাবীগণ রয়েছেন।' অন্যত্র বলেছেন, 'তোমাদের জন্য অবধারিত করছি আমার এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শের অনুসরণ।'

এখানে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, ইসলামী অগ্রযাত্রা ও ইসলামী জীবনসাধনার সঠিক দিকনির্দেশের জন্য কুরআন ও সুন্নাহকে মূল উৎস সাব্যস্ত করা হয়েছে। ইসলামী জীবনব্যবস্থার আদর্শ ও মাপকাঠিরূপে অভিহিত করা হয়েছে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর সহচরবৃন্দের অনুসৃত পথ, যা প্রধানতই ব্যবহারিক ও সান্নিধ্যগত আদর্শ। বই-পুস্তক ও তত্ত্ব প্রধান নয়। যে জন্য সাহাবায়ে কেরামের মূল সময়কালের শেষ পর্যায়ে আমরা পবিত্র মদীনা মুনাওয়ারায় হযরত মালেক ইবনে আনাসকে (রহ.) দেখতে পাই গোটা মুসলিমসমাজের লোকশিক্ষক ও দিকনির্দেশক হিসেবে। ইসলামের ওপর আমল করার জন্য মদীনাবাসী তখন থেকেই কুরআন ও সুন্নাহ নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে গবেষণা বা অনুসন্ধান শুরু না করে ফকীহ ও আলেম ইমাম মালেকের ফিকাহ বা মাযহাবের ওপর, তার নির্বাচন ও পর্যবেক্ষণের ওপর নিশ্চিন্তে নির্ভর করেছেন। এরও বহু আগে থেকে মক্কাবাসীরা নির্ভর করেছেন হযরত ইবনে আববাস (রা.)-এর ওপর। এর কিছুদিন পর থেকে বৃহত্তর ইরাকবাসী ইমামে আজমের ফিকহের ওপর। আর এটিই কুরআন ও সুন্নাহর বিধান। আল্লাহ তা'আলা যেমন বলেছেন, তোমরা অনুসরণ করো আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের। আর অনুসরণ করো তোমাদের উলুল আমর বা শরীয়তী অথরিটির। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, পিতার সন্তুষ্টিতেই রয়েছে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি। তো আমার পুত্রকে দৈনন্দিন জীবনের যে শরীয়ত সম্পর্কিত শিক্ষা-দীক্ষা আমি দেব তা তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করা ও তার ওপর আমল করাও পুত্রের ওপর শরীয়তেরই নির্দেশ। এখানে আমাদের মধ্যকার এ আদান-প্রদান কিছুতেই কুরআন-সুন্নাহবিবর্জিত বা বিরোধী নয়। মুসলিমজাতির হাতে তাদের শরীয়তের ব্যবহারিক রূপরেখা সমন্বিত ও সংকলিত আকারে তুলে দেওয়ার জন্য মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশে যেসব সাহাবী,

তাবেয়ী ও পরবর্তী যুগের ফকীহগণ কঠোর জ্ঞান-গবেষণা ও সাধনা করেছেন তাদের মর্যাদা বা গুরুত্ব নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়, একখানা উদ্ধৃতি উল্লেখ করাই বিষয়টির মাহাত্ম্য উপলব্ধি করার জন্য যথেষ্ট মনে হয়। হযরত নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর একজন বিখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রা.) বলেন, রাতের কিছু সময় ইলম চর্চা করা রাতভর নফল ইবাদতের চেয়েও উত্তম। কুরআন-সুন্নাহর ভেতর মানবজীবনের উদ্ভূত যেকোনো সমস্যার সমাধান পেয়ে গেলে এ থেকেই আমাদের তা গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সমাধানে পৌঁছার জন্য নিজের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও বিবেচনার আশ্রয় নিতে হবে। এটি হযরত নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শ। হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) কে ইয়েমেনে পাঠানোর সময় তার মুখ থেকে এ কথা শুনতে পেয়ে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খুশি হয়ে আল্লাহর শোকর গোযারি করেছিলেন।

ইসলাম পৃথিবীর সর্বকালের সকল মানুষের জন্য চিরস্থায়ী জীবনব্যবস্থারূপে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস প্রভৃতির মূলনীতির ভিত্তিতে ফকীহ ও মুজতাহিদ সাহাবীগণের মাধ্যমে ব্যবহারিক বিধানরূপে, সমস্যার সমাধানরূপে, বিচারালয়ে ফয়সালারূপে জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে অতুলনীয় ব্যবস্থারূপে তার ব্যাপক আকার পরিগ্রহ করতে থাকে। ব্যবহারিক জীবনে ইসলামের নানা বিধানে কিছু বৈচিত্র্য ইসলামের বিশালত্ব, ব্যাপ্তি ও কালজয়ী গুণেরই বহিঃপ্রকাশ। অসংখ্য বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের পর্যবেক্ষণে ছিল অনেক মতবৈচিত্র্য! এ ইসলামের এক স্বীকৃত রীতি। প্রায়োগিক বিধানের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ তথা বিস্তারিত ফিকহ রচনার সময়ও মুজতাহিদ আলেমগণের পর্যবেক্ষণ, উপলব্ধি ও নির্বাচনে এ ধরনের বৈচিত্র্য ফুটে ওঠে। শরীয়তে চিন্তার এ বৈচিত্র্যকে উৎসাহিত করা হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে মূল কথা হচ্ছে, কুরআন মজীদ, সুন্নাহ, প্রথম যুগের প্রচলন, সাহাবীদের ঐক্যমত আর পূর্ববর্তী নজির অনুসরণ। এসব মূলনীতি বিশ্লেষণ করেই আপেক্ষিক বিষয়ের মধ্যে একটিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। আর এ ইজতিহাদী তত্ত্বের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠেছে ইসলামের বহু মাযহাবসংবলিত ব্যবহারিক ফিকহ।

কুরআন-সুন্নাহ ও এর প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় যে সুযোগ্য ব্যক্তির নখদর্পণে, মুসলিম জাতির প্রয়োজনে তিনিই পারেন ইজতিহাদ করতে। কেননা, সাহাবায়ে কেরামের মতবৈচিত্র্যপূর্ণ কোনো বিষয় কিংবা সাহাবীদের যুগের পরবর্তী কোনো নতুন সমস্যার সমাধান নির্বাচন ও পর্যবেক্ষণ ছাড়া কার্যকর করা সম্ভব ছিল না। ফলে অসংখ্য মত ও মাযহাবের বৈচিত্র্য ছিল খুবই স্বাভাবিক, যার মধ্যে অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ চারটি মাযহাবের সাথে মুসলিম জনসাধারণ সমধিক পরিচিত। এসব মাযহাবের কোনোটিই কুরআন-সুন্নাহবহির্ভূত নয় এবং কোনোটিই এমন নয়, যার অনুসরণ করলে আমরা কুরআন-সুন্নাহর অনুসারী বলে গণ্য হব না। এমনকি একটি মাযহাবের ইমাম অপর মাযহাবের ইমামের এলাকায় বেড়াতে গিয়ে তার ফিকহ অনুসারেই আমল করেছেন এমন উদাহরণও ইমামদের জীবনে দেখা যায়। যেন আমরা বুঝতে সক্ষম হই যে মাযহাব কেবলই নির্বাচন ও পর্যবেক্ষণের বিষয়।

কুরআন-সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের সমন্বয়ে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তের বহুমাত্রিকতা থেকে একটি অবস্থাকে প্রাধান্য দেওয়ার নাম তারজীহ। আর এ প্রাধান্যপ্রাপ্ত সমাধানগুলোই হচ্ছে মাযহাবের বৈচিত্র্যপূর্ণ অংশ। অতএব মাযহাব মানা আর কুরআন-সুন্নাহ মানার মধ্যে কোনোই ফারাক থাকার কথা নয়। তাছাড়া সাধারণ মুসলমানের পক্ষে কোনো আংশিক বা সামগ্রিক, প্রসিদ্ধ কিংবা অখ্যাত মাযহাব অনুসরণ ছাড়া শরীয়তের ওপর আমল করাও প্রায় অসম্ভব।

কেননা, ইসলামের বিশালত্ব, চিরস্থায়িত্ব ও সর্বকালের সকল অঞ্চলের মানুষের উপযোগী ধর্ম ও জীবনব্যবস্থা হিসেবে এর ভেতরকার সব কিছুই পরম উদার ও বৈজ্ঞানিক। এতে অনেক সুযোগ, উদারতা ও বিস্তৃতি রয়েছে। জীবন ও জগতকে গতিশীল উপায়ে এগিয়ে নেওয়া ইসলামের প্রেরণা। সুতরাং এখানে প্রায় সব বিষয়েই অনেক এখতিয়ার, অনেক সহজতা। ইসলামের মূল ইবাদত নামাযের ভেতর যত বৈচিত্র্য ও সহজতা মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবন থেকে হাদীসের মারফত আমরা পাই, এর সবগুলোর উপরই আমাদের আমল করার বৈধতা ও যুক্তি রয়েছে। এতে একজন বিজ্ঞ মুজতাহিদ যখন একটি নামায পদ্ধতি আমাদের জন্য কুরআন-সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াসের আলোকে নির্বাচন করবেন, তখন সেটাই এক এলাকার, এক সংস্কৃতির মানুষকে ধারণ করতে হবে। এ পদ্ধতির চর্চাই পরস্পরগতভাবে প্রজন্মান্তরে চলতে থাকবে। শুধু নামায নয়, যাকাত, হজ্ব, কুরবানী, পাক-নাপাক, হালাল-হারাম,

জায়েয-নাজায়েযের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এভাবে মাযহাবের প্রয়োজনীয়তা মুসলিমজাতি উপলব্ধি করবে। সর্বোপরি, সকল মাযহাবের ইমামদের অভিন্ন একটি কৈফিয়ত ইসলামে রয়েছে যে আমার নির্বাচিত মাসআলার বিপরীতে যদি আরো শক্তিশালী প্রমাণ খুঁজে পাও তাহলে আমার মাসআলা ত্যাগ করো। বিশুদ্ধ হাদীস যদি আমার সিলেকশনকে চ্যালেঞ্জ করে তাহলে আমার কথাকে ছুড়ে ফেলে দাও। এখানে অবশ্য একজন মুজতাহিদের নির্বাচনকে যাচাই করার জন্যও ন্যূনতম কিছু যোগ্যতার প্রয়োজন। সাধারণ একজন দর্শক, শ্রোতা বা পাঠকের পক্ষে এ ক্ষেত্রে নাক গলানো খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ও অসংগত।

যদি কোনো ব্যক্তি নিজেই শরীয়তের সকল শর্ত পূরণ করা একজন মুজতাহিদ হন তাহলে তিনি কোনো ইমামের মাযহাব অনুসরণ না করে নিজেই কুরআন-সুন্নাহর আলোকে জীবন যাপন করতে পারেন। তবে কুরআন-হাদীসের অনেক শাস্ত্রবিদ মনীষীও এ ধরনের ঝুঁকি নিতে চাননি। কেননা বিষয়টি শরীয়তের এক বা দুই শাস্ত্রের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়, কুরআন ও হাদীসসংক্রান্ত সকল মৌলিক শাস্ত্রে গভীর ব্যুৎপত্তির অধিকারী হয়ে নিজেকে নতুন পথের পন্থী দাবি করা চাট্টিখানি কথা নয়।

অতএব নির্দ্বিধায় আমরা স্বীকৃত মাযহাবগুলোর ওপর আমল করতে পারি। কর্মসূচিগত ও সামাজিক শৃঙ্খলার জন্য যেকোনো একটি মাযহাবকে বেছে নেওয়া জরুরি। যেমন, একটি বহুতল ভবনে ওঠার জন্য যদি সিঁড়ি, এসকেলেটর, লিফট, ক্রেন, রশি প্রভৃতি উপায় থাকে তাহলে একই সঙ্গে একাধিক উপায় অবলম্বন করা শৃঙ্খলাবিরোধী কাজ বলে বিবেচিত। একটি পন্থাই বেছে নিতে হবে আমাকে। তাছাড়া ধর্মীয় কার্যক্রমের ক্ষেত্রে একটি পন্থা অনুসারে আমল করা এজন্যও কর্তব্য যে ইবাদত বা আচরণে অস্থিরতা এর আবেদনকে বহুলাংশে ক্ষুণ্ন করে থাকে।

অতএব স্বাভাবিকভাবেই আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি, মাযহাব অনুসরণ করলে প্রকৃতপক্ষে আমি কুরআন-সুন্নাহই অনুসরণ করলাম। আমি তখন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত। আমি তখন আহলে কুরআন, আহলে হাদীস। আমিই তখন সালাফী বা পূর্ববর্তী মুরব্বীদের অনুসারী। কেননা, এসব পথের মূল প্রেরণা আর মাযহাব সংকলনের প্রেরণায় কোনোই বিরোধ নেই।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দ্বীনের সঠিক বোধ ও উপলব্ধি দান করুন, আমীন।

মাসিক আল-আবরারের গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলি

এজেন্ট হওয়ার নিয়ম

*	কমপক্ষে ১০ কপির এজেন্সি দেয়া হয়।
*	২০ থেকে ৫০ কপি পর্যন্ত ১টি, ৫০ থেকে ১০০ পর্যন্ত ২টি, আনুপাতিক হারে সৌজন্য কপি দেয়া হয়।
*	পত্রিকা ভিপিএলে পাঠানো হয়।
*	জেলাভিত্তিক এজেন্টদের প্রতি কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়। লেনদেন অনলাইনের মাধ্যমে করা যাবে।
*	২৫% কমিশন দেয়া হয়।
*	এজেন্টদের থেকে অগ্রীম বা জামানত নেয়া হয় না।
*	এজেন্টগণ যেকোনো সময় পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে অর্ডার দিতে পারেন।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

বার্ষিক চাঁদার হার

	দেশ	সাধ.ডাক	রেজি.ডাক
#	বাংলাদেশ	৩০০	৩৫০
#	সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০	১০০০
#	মধ্যপ্রাচ্য	১১৮০	১৩০০
#	মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া	১৩০০	১৫০০
#	ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া	১৬০০	১৮০০
#	আমেরিকা	১৮০০	২১০০

১ বছরের নিচে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক চাঁদা মনিঅর্ডার, সরাসরি অফিসে বা অনলাইন ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানো যায়।

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট :

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-৪০১৯১৩১০০০০০১২৯

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-০৮৬১২২০০০০৩১৪

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ

পরিচালনায় : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রসঙ্গ : খোৎবা

মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন
নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

খতীব সাহেব ঈদ এবং জুমু'আর নামাযের খোৎবা আরবী এবং বাংলা ভাষায় দেন। তিনি বলেন, "আমরা নামায পড়ি কা'বার দিকে মুখ করে এটা আল্লাহর জন্য যেহেতু খোৎবা মুসল্লিদের দিকে মুখ করে পড়ানো হয় এটা মুসল্লিদের বোঝার জন্য। খোৎবা হচ্ছে বক্তৃতা, মুসল্লি যদি না বুঝে ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যাখ্যা দেন। সুতরাং খোৎবা কোন ভাষায় হতে হবে এ ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী?

সমাধান :

রাসূলুল্লাহ (সা.) সর্বদাই আরবীতে খোৎবা প্রদান করেছেন। তারপর সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তবে তাবেঈনের যুগে ইসলাম আরব জাহানের গণ্ডি অতিক্রম করে বিভিন্ন ভাষাভাষীদের দেশে প্রসার লাভ করে। সেখানে শ্রোতাগণ অনারবী হওয়া ও সাহাবা তাবেঈনদের অনেকে অন্যান্য ভাষায় পারদর্শী হওয়া সত্ত্বেও তারা সর্বদা আরবীতে খোৎবা প্রদান করেছেন। বিধায় ফুকাহা মুহাদ্দেসীনের মতে আরবীতে খোৎবা প্রদান করাই সুন্নাতে মুআক্কাদা। সুন্নাতে মুআক্কাদা ছেড়ে দেওয়াকে ফেকাহবিদগণ গোনাহের কাজ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। বিধায় শরীয়তের বিধান মতে আরবী ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় খোৎবা প্রদান করা মাকরূহে তাহরীমী তথা নাজায়েয। (আদ্দুররুল মুখতার ১/৪৮৩, এমদাদুল ফতাওয়া ১/৬৫৫)

প্রসঙ্গ : খতম তারাবীহ

মাও. আশরাফ আলী
বসুন্ধরা রিভারভিউ, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

রমাজানে হাফেজরা খতমে তারবীহ পড়িয়ে বিনিময় নেওয়া জায়েয আছে কি না? জায়েয না হলে তাদের পেছনে নামায পড়ার হুকুম কী? যে মুসল্লিরা তাদের পেছনে এক্তেদা করবে তারা সাওয়াব পাবে কি না?

ক. কোনো কেনো মসজিদে হাফেজরা এক ওয়াক্ত কিংবা দুই ওয়াক্ত নামাযের ইমামতির দায়িত্ব কিংবা মুআযযিনের দায়িত্ব নিয়ে তারা বলে আমরা কুরআনের বিনিময় নিচ্ছি না ইমামতি বা মুআযযিনির বিনিময় নিচ্ছি। এখন প্রশ্ন হলো, এ রকম কৌশলের মাধ্যমে পারিশ্রমিক বা বিনিময় নেওয়া জায়েয হবে কি না?

খ. হাফেজরা মেহনত করে তারাবীহ পড়ায়। সুতরাং তাদেরকে বিনিময় ইত্যাদি দেওয়ার কোনো কৌশল বা নিয়ম আছে কি না?

সমাধান :

তারাবীহতে কুরআনের বিনিময় দেওয়া এবং গ্রহণ করা উভয়ই নাজায়েয। বিনিময় গ্রহণ করে এমন হাফেজের পেছনে নামায না পড়ে সূরা তারাবীহ পড়বে।

ক. এক ওয়াক্ত বা দুই ওয়াক্ত নামাযের ইমামতি বা মুআযযিনীর দায়িত্ব নিয়ে খতমে কুরআনের বিনিময় গ্রহণ করাকেও মুফতীয়ানে কেরাম নাজায়েয বলেছেন। তবে এ ক্ষেত্রে এক-দুই ওয়াক্ত নামাযের ইমামতি বা মুআযযিনীর স্বাভাবিক বিনিময় নির্দিষ্ট করে নিতে পারবে।

খ. হাফেজগণ মেহনত করে ইবাদত করেন, আর ইবাদতের বিনিময় নেওয়া বৈধ নয়। (আদ্দুররুল মুখতার ২/১৭৯, রাদ্দুল মুহতার ৬/৫৬, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম ৪/২৪৬)

প্রসঙ্গ : মসজিদ

মুহা. আনিসুর রহমান
খাটিয়ামারী, ধুনট।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের এলাকায় পুরাতন একটি মসজিদ ছিল। এখন আমাদের মুসল্লি বেড়ে যাওয়ায় আমরা আরেকটি নতুন মসজিদ করেছি। নতুন মসজিদটি সরকারিভাবে ওয়াকফ করা হয়েছে। সেখানে জুমু'আর নামায চালু করতে চাই। এখন কিছু কিছু লোক বলে যে, নতুন মসজিদে জুমু'আর খোৎবা ইত্যাদি সহীহ হবে না। পায়ে হেঁটে গেলে পুরাতন মসজিদ থেকে প্রায় ৮-১০ মিনিট লাগে এমতাবস্থায় এ মসজিদে নামায হবে কি না?

সমাধান :

প্রশ্নের বিবরণ অনুযায়ী দ্বিতীয় মসজিদে জুমু'আ আদায় করতে শরয়ী কোনো বিধিনিষেধ নেই। যারা সহীহ হবে না বলে তাদের কথা সঠিক নয়। (রদ্দুল মুহতার ১/৫৩১, আল ফিক্বহুল ইসলামী ২/২৭২)

প্রসঙ্গ : আক্বীকা

মাওলানা আবুল বাশার শওকতী
বায়তুল মা'মুর জামে মসজিদ,
সাভার, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

আমি একটি কুরবানীর পশু ক্রয় করেছি। এখন তাতে আমার ছেলে বা মেয়ের আক্বীকা দিতে চাই। অতএব ক্রয়কৃত উক্ত পশু দিয়ে কুরবানী ও আক্বীকা একসঙ্গে দেয়া যাবে কি না?

সমাধান :

প্রশ্নে বর্ণিত ক্রয়কৃত পশু (গরু) দিয়ে কুরবানী ও আক্বীকা একসঙ্গে দিতে পারবেন। (রদ্দুল মুহতার ৬/৩২৬, ফাতাওয়া রহিমিয়া ২/৮০)

প্রসঙ্গ : মেশিনের সাহায্যে মুরগি ড্রেসিং

ডা. মুহা. মাহমুদুল হাসান
সিনিয়র মেডিক্যাল অফিসার
অ্যাপোলো হাসপাতাল, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

প্রচলিত পদ্ধতিতে মেশিনে মুরগি ড্রেসিং করে খাওয়া জায়েয আছে কি না? উল্লেখ্য, প্রচলিত পদ্ধতিতে মুরগি জবাই করে সরাসরি গরম পানিতে কিছুক্ষণ রেখে এরপর মেশিনে দিয়ে ড্রেসিং করা হয়। এমনকি ওই একই গরম পানিতে পরবর্তী মুরগিগুলো দেয়া হয়।

সমাধান :

বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতিতে ফুটন্ত গরম পানিতে জবাইকৃত মুরগি বেশিক্ষণ রেখে দেয়ার কারণে ভেতরের নাড়িভুঁড়ির নাপাকী গোশতের ভেতরে মিশে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এতে মুরগি নাপাক হয়ে যাওয়ায় তা খাওয়া জায়েয হবে না।

পক্ষান্তরে যদি ফুটন্ত গরম পানিতে ডুবিয়ে সাথে সাথে উঠিয়ে ফেলার দরুন নাড়িভুঁড়ির নাপাকী গোশতের সাথে মিশে যাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে এ ক্ষেত্রে উক্ত মুরগির গোশত নাপাক হবে না এবং তা খাওয়া জায়েয হবে। এ ছাড়া যদি পাক-পবিত্র গরম পানিতে দেয়ার আগেই নাড়িভুঁড়ি বের করে নেয়া হয়, তাহলেও নাপাক হবে না এবং খাওয়াও জায়েয হবে।

উল্লেখ্য, ফুটন্ত গরম পানিতে জবাইকৃত মুরগি ডুবানোর ফলে উক্ত পানি নাপাক হয়ে যায়। তাই একবার মুরগি ডুবানোর পর উক্ত নাপাক পানিতে পুনরায় অন্য মুরগি দিলে নাপাক হয়ে যাবে। (আদ্দুররুল মুখতার ১/৫৬, আহসানুল ফাতাওয়া ২/৯৬)

প্রসঙ্গ : দাড়ি, খোৎবা

মুহাম্মদ আব্দুল আওয়াল
ধানমণ্ডি, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা : নিম্নলিখিত দুটি বিষয়ে কুরআন-হাদীসের আলোকে সমাধান দিয়ে বাধিত করবেন।

১। স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া দাড়ি রাখা শরীয়তের দৃষ্টিতে কী? দাড়ি রাখতে কি স্ত্রীর অনুমতির প্রয়োজন আছে?

২। আমাদের মসজিদের খতীব সাহেব খোৎবা প্রদানের সময় এক হাতে লাঠি এবং আরেক হাত তাহরীমার মতো বেঁধে রাখেন। শরীয়তের দৃষ্টিতে কি এরূপ করার অনুমতি আছে?

সমাধান :

শরীয়তের দৃষ্টিতে দাড়ি রাখা ওয়াজিব। তাই দাড়ি রাখার বিষয়ে স্ত্রী কিংবা অন্য কারো অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। (বুখারী শরীফ ৮৭৫, মুসলিম শরীফ ১২৯, আবু দাউদ শরীফ ৫৭৭, আদদুররুল মুখতার ১/১৫২, এমদাদুল ফাতাওয়া ৪/২২৩)

২. হাদীস শরীফে রাসূল (সা.) কর্তৃক খোৎবা দেওয়ার সময় হাতে লাঠি নেওয়া ও না নেওয়া উভয়টি প্রমাণিত। তাই খোৎবা দেওয়ার সময় হাতে লাঠি নেওয়ার অবকাশ আছে, তবে না নেওয়াই উত্তম। (আবু দাউদ শরীফ ১৫৬, ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া ৪/৫৬৫, কেফায়াতুল মুফতী ৩/২৬০)

প্রসঙ্গ : জমি আত্মসাৎ

মুহা. আব্দুস সালাম
মোয়াজ্জেমপুর, কামালপুর, বাহাদুর নগর, নান্দাইল, ময়মনসিংহ।

জিজ্ঞাসা :

আমরা চার ভাই পৃথক থাকি। আমার মা আমার পরিবারের সাথে থাকেন, তার কিছু জমি আছে। সেখান থেকে কিছু জমি বিক্রি করতে চাইলে আমি তা ক্রয় করি। জমি দলিল করার সময় মার নিকট দলিল অফিসের কথা গোপন রেখে তাকে দলিল অফিসে নিয়ে যাই এবং ক্রয়কৃত জমিসহ মায়ের অতিরিক্ত জমি ও ভাইয়ের জমিসহ দলিল করে নিই। এই কথা মা যখন জানতে পারলেন তখন আমার পরিবার ছেড়ে অন্য ভাইয়ের পরিবারে চলে গেলেন উক্ত ঘটনার কারণে তিনি আফসোস করতে করতে শেষ পর্যন্ত ১০ দিন পর ইন্তেকাল করেন। এখন উক্ত জমির ক্ষেত্রে সমাধান কী হবে?

সমাধান :

অন্যের জমি আত্মসাৎ করা বড় গোনাহ। আখিরাতে জমি আত্মসাৎকারী কঠিন আযাবের সম্মুখীন হবে, বিধায় অনতিবিলম্বে তওবা করত ক্রয়কৃত অংশ ব্যতীত বাকি আত্মসাৎকৃত জমি হকদারের দখলে দিয়ে দেওয়া ওয়াজিব। (বাদায়িউস সানায়ি ১০/২২)

প্রসঙ্গ : আমানতের টাকা চুরি

মুহা. মুত্তাকি বিল্লাহ
জামিল মাদরাসা, বগুড়া।

জিজ্ঞাসা :

আমি একজন কওমী মাদরাসার শিক্ষক পরিবারসহ মাদরাসার বাসায় থাকি। গত রমাজান মাসে যাকাত আদায়ের জন্য মাদরাসা হতে রসিদ বই উঠাই এবং যথারীতি আদায় করি। উল্লেখ্য, মাদরাসা খোলার পরই উক্ত টাকাগুলো জমা দেওয়া হয় বিধায় আমি আমার ব্যক্তিগত টাকাসহ আদায়কৃত যাকাতের

টাকা বাসায় হেফাজতে রেখে তালা লাগাই এবং ঈদের পর দিন বাড়ি যাই। মাদরাসা খোলার পর মাদরাসায় এসে বাসায় গিয়ে দেখি তালা ভাঙা অনেক আসবাবপত্র ও টাকাগুলো চুরি হয়ে গেছে। মুহতামিম সাহেবকে জানানোর পর মুহতামিম সাহেব কয়েক মাস সময় দেন পরিশোধের জন্য। আমার জানার বিষয় হলো, আদায়কৃত যাকাতের টাকাগুলো আমার কাছে আমানত কি না? তা পরিশোধ করা আমার কর্তব্য কি না?

সমাধান :

প্রশ্নে বর্ণিতাবস্থায় যাকাতের আদায়কৃত টাকাগুলো আপনার কাছে আমানত ছিল। আর তা মাদরাসার অফিসে জমা দেওয়া বা রাখার মাধ্যমে হেফাজতের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও নিজ বাসায় রাখায় আপনার জন্য তা পরিশোধ করা কর্তব্য। (আহসানুল ফাতাওয়া ৭/২৫২, আল বিনায়াহ ৯/১৩৩)

প্রসঙ্গ : রোজার ফিদিয়া

মুহা. মুনিরুল ইসলাম
আল মাদরাসা দারুস সুন্নাহ,
ব্লক-এ, রোড-২, প্লট-১১০, বসুন্ধরা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের এলাকায় ফিদিয়া দেওয়ার প্রচলন আছে। আবার কেউ কেউ বলেন যে, ফিদিয়া দেওয়ার হুকুম মানছুখ হয়ে গেছে। আমার প্রশ্ন হলো, যদি কেউ অসুস্থ, বয়সজনিত কারণে রোজা না রাখতে পারে তাহলে ফিদিয়া দিতে হবে কি না?

সমাধান :

যদি কোনো ব্যক্তি এমন অসুস্থ হয় যার ফলে সে রোজা রাখতে অক্ষম এবং সুস্থ হওয়ারও কোনো আশা নেই। অনুরূপভাবে বয়সজনিত কারণে যদি রোজা রাখতে অক্ষম হয় তাহলে তাদের প্রতি রোজার পরিবর্তে পৌনে দুই সের গম বা তার বাজারমূল্য গরিব-মিসকীনকে ফিদয়া হিসেবে দিতে হবে, যা কুরআনে পাকের সুস্পষ্ট আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং ইসলামের সোনালি যুগ থেকে আজ পর্যন্ত এ বিধান চলে আসছে। যারা এ হুকুম মানসুখ বলে তাদের কথা সঠিক নয়। তবে ফিদিয়া আদায়ের পর যদি পুনরায় সক্ষম হয় তবে ওই রোজা কাযা করতে হবে। (বুখারী শরীফ ২/৬৪৭, নাসাঈ শরীফ ১/২৪৮)

প্রসঙ্গ : আযান

মাও. আব্দুল ওয়াহিদ
ইমাম ও খতিব
ঢাকা ম্যাচ জামে মসজিদ।

জিজ্ঞাসা

আমাদের জামে মসজিদে একজন মুয়াজ্জিন সাহেব দীর্ঘদিন থেকে আযান-ইকামতের জন্য নিয়োজিত আছেন, কিন্তু তার আযান অশুদ্ধ হওয়ায় এলাকাবাসী আযান দেয়ার জন্য একজন মুয়াজ্জিন নির্ধারণ করেছেন। তিনি শুধু আযান দিয়ে চলে যান আর পূর্বের মুয়াজ্জিন সাহেব ইকামত দেন। প্রশ্ন হলো, একজন আযান দেয়া ও অপরজন ইকামত দেয়া কতটুকু শরীয়তসম্মত?

সমাধান

কোনো ওযর না থাকলে একই ব্যক্তির আযান ও ইকামত দেয়া উত্তম এবং বিনা প্রয়োজনে আযান দিয়ে মসজিদ থেকে চলে যাওয়া মাকরুহ। আযানের মতো ইকামত ও সহীহ শুদ্ধ হওয়া জরুরি। তাই আযান ইকামত শুদ্ধ করতে অপারগ হলে পূর্বের মুয়াজ্জিন সাহেবকে পরিবর্তন করা কমিটির একান্ত কর্তব্য। (ফাতাওয়া শামী ১/৩৯৫)

প্রসঙ্গ : কৃত্রিম বাছুর

মুহা. ফরহাদ হুসাইন
কাগমারী, টাঙ্গাইল।

জিজ্ঞাসা

(১) গাভির বাচ্চা মারা গেলে মানুষ সেই বাচ্চার চামড়া খুলে কৃত্রিম বাচ্চা বানায় এবং সেই কৃত্রিম বাচ্চা দিয়ে দুধ দোহন করে। এই ধরনের দুধ দোহন করা বা দোহনকৃত দুধ খাওয়া জায়েয হবে কি না?

সমাধান : (১) ওই কৃত্রিম বাচ্চা দিয়ে দুধ দোহন করা বা দোহনকৃত দুধ খাওয়া জায়েয। (এমদাদুল ফাতাওয়া ৪/১৫৪)

প্রসঙ্গ : মাদরাসা

জিজ্ঞাসা : (২) আমার স্ত্রীসহ মাদরাসায় থাকা খাওয়া ফ্রি। আমার কোনো মেহমান এলে মাদরাসার খানা খাওয়ানো জায়েয হবে কি না?

সমাধান : (২) নিজের মেহমানকে মাদরাসার খানা খাওয়ানো জায়েয নয়। তবে মাদরাসা কর্তৃপক্ষের অনুমতি থাকলে জায়েয। (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১৫/২৬৮, রদ্দুল মুহতার ৪/৫০২)

প্রসঙ্গ : তাবলীগ

হাফেজ রিদওয়ান
ধানমণ্ডি, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা

প্রচলিত দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত, যা দিল্লির নিযামুদ্দীন মারকায থেকে বিশ্বময় পরিচালিত হচ্ছে শরীয়তে এর বিধান কী? টঙ্গীর ইজতেমায় জনৈক মুরব্বীর বয়ানে এই মেহনতকে ফরজে আইন আখ্যা দেয়া হয়েছে। বাস্তবে এ কথাটি কতটুকু সঠিক? প্রচলিত দলবদ্ধ তাবলীগ ফরজে আইন না কি ফরজে কেফায়াহ? এ ক্ষেত্রে মহিলা-পুরুষ সকলের হুকুম এক কি না?

সমাধান :

আল্লাহ তা'আলা দাওয়াত ও তাবলীগের গুরু দায়িত্ব রাসূল (সা.) সাহাবায়ে

কেরাম থেকে নিয়ে অদ্যাবধি তাঁর মনোনীত বান্দাদের মাধ্যমে আঞ্জাম দিয়ে আসছেন। তবে তার পদ্ধতি একেক যুগে একেক ধরনের ছিল। বর্তমানে তাবলীগ জামা'আত তার মধ্যে অন্যতম, যা রাসূল (সা.) ও সালাফে সালেহীনের পূর্ণ অনুসারী। যার মাধ্যমে মানুষ দ্বীনের ওপর জীবন পরিচালনার জন্য যতটুকু ইলমের দরকার ততটুকু দ্বীনি ইলম শিক্ষা করছেন এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে মানুষকে তার শিক্ষা দিচ্ছেন। সুতরাং বর্তমানে এ দলটি সমষ্টিগতভাবে প্রশংসনীয় কাজ আঞ্জাম দিয়ে আসছেন, যা গোটা মানবজাতির জন্য কল্যাণকর। তাই এ কাজের গুরুত্ব অপরিসীম। তবে শরীয়তের নীতিমালা ও দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে এই পদ্ধতি ফরযে আইন ও ফরযে কেফায়ার অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং ফরযে কেফায়া হলো সমষ্টিগতভাবে দ্বীন প্রচারের যেকোনো একটি পদ্ধতি গ্রহণ করা। যেকোনো একদল এই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করলে সকলের পক্ষ থেকে দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু নারী-পুরুষের কর্মপরিধি ভিন্ন হওয়ায় এ দায়িত্ব পালনে নারী-পুরুষ সমান নয়। যেহেতু নারীদের দায়িত্ব ও কর্মজীবন সীমিত এবং তার পরিধি ও সীমাবদ্ধ তাই তাদের জন্য শরীয়ত নির্ধারিত গণ্ডি এবং সীমানার ভেতরে থেকে যতটুকু সম্ভব তারা ততটুকুই এ দায়িত্ব পালন করবে। সুতরাং মহিলারা নিজ ঘর বা মহল্লায় অবস্থান করে দাওয়াতের কাজ করবে। এতে তাদের দায়িত্ব পূর্ণ হবে। এর বাহিরে গেলে সীমালঙ্ঘনের প্রবল আশঙ্কা থাকে। (সূরা আলে ইমরান-১০৪, সূরা আহযাব-৩৪)

প্রসঙ্গ : দানপত্র

মাও. শওকত সাহেব
পশ্চিম চাম্বল, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।

জিজ্ঞাসা :

বাঁশখালী থানার অন্তর্গত পশ্চিম চাম্বল মুন্সীখিল নিবাসী জনাব মাওলানা মুহাম্মদ ছিদ্দিক আহমদ সাহেব মৃত্যুর পূর্বে তার ছোট ছেলে মরহুম আব্দুস সত্তারের সন্তানদেরকে ২ কানি জমি দানপত্র করে মারা যায়। বর্তমান মরহুম মাওলানা মুহাম্মদ ছিদ্দিক সাহেবের ওয়ারিশগণদের দাবি হলো মরহুম আব্দুস সত্তারের বড় ছেলে মাও. শওকত দাদাকে বাধ্য করে বা প্রতারণা করে এ দানপত্র দলিল করেছে। এখন প্রশ্ন হলো, ওয়ারিশগণ যদি তাদের দাবির পক্ষে দলিল প্রমাণ পেশ করতে না পারে তাহলে শওকতের ওপর শপথ আসবে কি না?

সমাধান

প্রশ্নোক্ত বর্ণনাতে ওয়ারিশগণ যদি তাদের দাবির পক্ষে দলিল প্রমাণ পেশ করতে না পারে তাহলে মাও. শওকত সাহেবের ওপর শপথ আসবে। (কাওয়াইদুল ফিকহ পৃ.৬৬, মুখতাসারুল কুদুরী পৃ. ২২৯)

প্রসঙ্গ : ৬ তাকবীরে ঈদের নামায

মুহা. শাহজাহান মেম্বার
নবাবগঞ্জ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, নবাবগঞ্জ, ঢাকা-১৩২০।

জিজ্ঞাসা :

খতীব সাহেব দীর্ঘদিন ধরে ৬ তাকবীরে ঈদের নামায পড়িয়ে আসছিলেন। হঠাৎ কোনো প্রকার আলোচনা ছাড়াই ঈদের নামায ১২ তাকবীরে পড়ান। এ বছর ঈদুল আযহার নামায কমিটি এবং মুসল্লিদের চাপে ৬ তাকবীরে পড়াতে বাধ্য হন। কিন্তু দ্বিতীয় রাকাতে কেরাত পড়ার পূর্বেই ৩ তাকবীর দিয়ে ৬ তাকবীরে নামায শেষ করেন। তিনি বলেন আমাকে ৬ তাকবীরে নামায জোর করে পড়ানো হলো, এর গোনাহগার কে হবেন এবং বলেন যে সৌদি আরবে ঈদের নামায ১২ তাকবীরে পড়ানো হয়। সৌদি আরবের ১২ তাকবীরের ঈদের নামাযের ভিডিওচিত্র কমিটিকে দেখানোর চেষ্টা করেন।

সমাধান :

ঈদের নামাযে প্রথম রাকাতে কেরাতের পূর্বে তিনটি এবং দ্বিতীয় রাকাতে কেরাতের পরে তিনটিসহ মোট ছয়টি অতিরিক্ত তাকবীর দেয়া ওয়াজিব। (আবু দাউদ ১/৬৮২, মু'জামুল কবীর ৯/৩৫১)

সুখবর ***সুখবর*** ***সুখবর***

প্রিয় পাঠকদের ভালোবাসা ও দু'আর বরকতে মহান আল্লাহর অফুরন্ত দয়ায় মাসিক আল-আবরার নিয়মিত প্রকাশনার দু'বছর অতিক্রম করছে চলতি মাসে। প্রতিটি সংখ্যায় প্রকাশিত তত্ত্ব ও তথ্যবহুল ধর্মীয় প্রবন্ধগুলো ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয় পাঠক মহলে। কোনো কোনো সংখ্যার চাহিদা এত ব্যাপক ছিল যে, পত্রিকার সবকটি কপি ফুরিয়ে যায়। ফলে বর্তমানে পাঠকদের পুরাতন সংখ্যার চাহিদা পূরণ আর সম্ভব হচ্ছে না। তাই বিগত সংখ্যাগুলোর তাত্ত্বিক ও তাথ্যিক প্রবন্ধগুলো নিয়ে

তোহফাতুল আবরার

নামে "মাসিক আল-আবরার প্রবন্ধসমগ্র" সিরিজ ১ প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছে আল-আবরার পরিবার। ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই তা প্রকাশিত হবে।

(মাসিক আল-আবরার সার্কুলেশন বিভাগসহ দেশের সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়সমূহ থেকে বইটি সংগ্রহ করা যাবে)

নবী চরিত্রের কিছু অনন্য সৌন্দর্য

হাফেজ রিদওয়ানুল কাদির উখিয়াভী

সাধারণত তাকওয়া বলতে আমরা দুনিয়াবিমুখতা, বেশ-ভূষায় মলিনতাকে বুঝে থাকি। বিভিন্ন ধর্মের বৈরাগ্যতার মত দুনিয়ার সাথে সম্পর্কহীনতাকেও অনেককে তাকওয়া মনে করতে দেখা যায়। অথচ সৌন্দর্য এবং পরিচ্ছন্নতা পরিত্যাগ করা ইসলামের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। বরং ইসলাম এ ধরনের অমূলক ধ্যান-ধারণা ও ভিত্তিহীন কুসংস্কারের প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারবাণী উচ্চারণ করেছে। রাসূলে করীম (সা.)-এর পুরো জীবনে এর বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা অত্যন্ত স্পষ্ট।

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ

হে নবী! আপনি বলুন, আল্লাহর সাজসজ্জাকে, যা তিনি বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র খাদ্যসমূহকে কে হারাম করেছে? আপনি বলুন এসব নেয়ামত আসলে পার্থিব জীবনে মুমিনদের জন্য এবং কিয়ামতের দিনে খাঁটিভাবে তাদেরই জন্য। (সূরা আল আ'রাফ ৩২)

অন্য স্থানে ইরশাদ করেছেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

হে মুমিনগণ! তোমরা ওই সব সুস্বাদু বস্তু হারাম করো না, যেগুলো আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন এবং সীমা অতিক্রম করো না। (সূরা মায়েদাহ ৮৭)

এ কারণেই নবী করীম (সা.) যখন জানতে পারলেন যে, কিছু সাহাবী সর্বদা রোযা রাখা, সারারাত ইবাদত বন্দেগী করা, গোশত না খাওয়া এবং স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক না রাখার সংকল্প করেছেন, তখন নবী করীম (সা.) তাদের ইবাদতের এই পদ্ধতিকে অপছন্দ করে একটি ভাষণ প্রদান করেন। তিনি ইরশাদ করেন–

আমি এ ধরনের ইবাদত করতে আদিষ্ট হইনি। তোমাদের ওপর তোমাদের আত্মারও অধিকার রয়েছে। রোযা রাখবে, খানাপিনাও খাবে। রাতে ঘুমাবে, ইবদাতও করবে। আমার অনুসরণ করো। আমি রাতে ঘুমাই, আবার ইবাদতও করি। কোনো সময় রোযা রাখি, আবার কোনো সময় ছেড়ে দিই। যে আমার সুন্নাতকে ভালোবাসবে না সে আমার দলভুক্ত নয়। অতঃপর ইরশাদ করেন, লোকদের কী হলো, তারা স্বীয় স্ত্রী, সুস্বাদু খাদ্য, খুশবু, নিদ্রা এবং দুনিয়ার সুস্বাদু বস্তুসমূহকে নিজের ওপর হারাম করে নিয়েছে? আমি তোমাদেরকে বলি না তোমরা পাদ্রী এবং সন্নাসী হয়ে যাও। আমার আনীত ধর্মে বৈরাগ্যতা বলতে কিছুই নেই। আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করতে আমার ধর্মে রোযার প্রবর্তন করা হয়েছে। এখানে জিহাদের মাধ্যমে বৈরাগ্যতার উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। আল্লাহর ইবাদত করো, তার সাথে কাউকে অংশীদার করো না। হজ্ব এবং উমরাহ আদায় করো, যাকাত দাও, রমাজানের রোযা রাখো। নিজের ওপর কড়াকড়ি করো না। পূর্ববর্তী উম্মত শুধু এ কারণেই ধ্বংস হয়েছে যে, যখন তারা নিজেদের ওপর কড়াকড়ি করেছে, আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর কড়াকড়ি করেন। তোমরা যে তাদের গির্জা ও উপাসনালয়গুলো দেখতে পাচেছা, এগুলো তাদেরই অবশিষ্টাংশ।

আল্লাহ তা'আলা রাসূল (সা.) কে কিয়ামত পর্যন্তের জন্য মডেল ও পথপ্রদর্শক বানিয়ে পাঠিয়েছেন। রাসূল (সা.)-এর পুরো জীবনীই মানবজাতিকে সঠিক পথের দিকে পথপ্রদর্শন করে। এ সম্পর্কে কোরআনের বক্তব্য হচ্ছে-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে। (সূরা আহযাব ২১) রাসূল (সা.)-এর আদর্শের একটি দিক হচ্ছে, হুজুর (সা.)-এর বাহ্যিক সৌন্দর্য। যার মাধ্যমে রাসূল (সা.) খ্রিস্টানদের বৈরাগ্যতা পরিত্যাগ করে সাজসজ্জার বিভিন্ন উপকরণ অবলম্বন করে উম্মতের সামনে বাহ্যিক সৌন্দর্যের বাস্তব নমুনা উপস্থাপন করেছেন। একদিকে তিনি তেল এবং আঁচড়িয়ে চুল পরিপাটি করেছেন। অপরদিকে আঁখি যুগলে সুরমা লাগিয়ে সৌন্দর্য বর্ধন করেছেন। মেসওয়াকের মাধ্যমে দাঁত পরিষ্কার রাখাকে অত্যাধিক গুরুত্ব প্রদান করতেন। খুশবু এবং নারীকে নিজের কাছে প্রিয় বস্তু ঘোষণা করে বৈরাগ্যতার কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকেছেন। কিন্তু এত সব সত্ত্বেও লাজ-শরমকে পরিত্যাগ করেননি এবং গাম্ভীর্য ও দৃঢ়তাকেও ধরে রেখেছেন। কৃত্রিমতা, উগ্রতা এবং অতিমাত্রায় শিথিলতাকে ধারে-কাছেও ঘেঁষতে দেননি। প্রত্যেক ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা এবং মানবিক গুণাবলির সযত্ন উপস্থিতি পরিলক্ষিত হতো। বাহ্যিক কিছু সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতেই আমাদের

আজকের এই প্রবন্ধে প্রয়াস পাব। আসুন একটু বিস্তারিতভাবেই আলোচনা করি। প্রথমেই হুজুর (সা.)-এর চুল মুবারকের সৌন্দর্য নিয়ে আলোকপাত করা যাক।

চুল :

নবী করীম (সা.) বিভিন্নভাবে চুল রাখতেন। কখনো কাঁধ পর্যন্ত, কখনো কানের লতি পর্যন্ত আর কখনো কান ও কাঁধের মাঝখান পর্যন্ত। রাসূল (সা.)-এর চুল মুবারকের সবচেয়ে প্রকৃষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন হুজুর (সা.)-এর চাচাতো বোন হযরত উম্মেহানী বিনতে আবু তালেব (রা.)। (মৃত ৪৬ হি.) তাঁর ভাষায় শুনুন–

قدم رسول الله ﷺ علينا مكة وله اربع غدائر

রাসূল (সা.) হিজরতের পর (আল্লামা বায়জুরী (রহ.)-এর মতে তা ছিল মক্কা বিজয়ের সময়) একবার আমাদের নিকট মক্কায় এসেছিলেন। আর তখন তাঁর মাথার চুল চারটি গুচ্ছে বিন্যস্ত ছিল। (শামায়েলে তিরমিযী হাদীস নং ২৭)

আবার চুল মুবারকে সামান্য কোঁকড়ানো বা ঢেউ খেলানো ভাব থাকায় চুলের সৌন্দর্য আরো বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। হযরত আনাস (রা.)। (মৃত ৯৩ হি.) এর ভাষায়–

لم يكن شعر رسول الله ﷺ بالجعد ولا بالسبط كان يبلغ شعره شحمة اذنيه

রাসূল (সা.) চুল মুবারক অত্যধিক কোঁকড়ানোও ছিল না আবার একেবারে সোজাও ছিল না। (বরং সামান্য কোঁকড়ানো বা ঢেউ খেলানো ভাব ছিল) তাঁর চুল মুবারক কানের লতি পর্যন্ত পৌঁছত। (শামায়েলে তিরমিযী ২৩)

এসব বর্ণনা থেকে একজন কালো, কোঁকড়ানো চুলবিশিষ্ট সুন্দর এবং অপরূপ ব্যক্তির অবয়বই আমাদের সামনে ফুটে ওঠে। যিনি প্রথম যুগে সিঁথি না কেটে অগোছালোভাবে চুল রাখতেন এবং পরবর্তীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) (মৃত ৬৮ হি.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী মাথায় সিঁথি কাটতেন। (শামায়েল ৩৯)

রাসূল (সা.) যখন চুল মুবারকে তেল লাগাতেন তখন চুল মুবারকের সৌন্দর্য, সৌকর্য, দীপ্তি এবং চমক আরো বহু গুণে বৃদ্ধি পেত। রাসূল (সা.) তেল ব্যবহার করতেন অনেক বেশি। এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করে হযরত আনাস (রা.) ইরশাদ করেছেন–

كان رسول الله ﷺ يكثر دهن رأسه و تسريح لحيته ويكثر القناع حتى كان ثوبه ثوب زيات۔

রাসূল (সা.) প্রায়ই মাথায় তেল ব্যবহার করতেন এবং প্রায়ই দাড়ি আঁচড়াতেন। অনেক সময় মাথায় অতিরিক্ত একটি কাপড়ের টুকরো ব্যবহার করতেন। (অত্যধিক তেল ব্যবহারের কারণে মনে হতো তা যেন তেল বিক্রেতার কাপড়)। (শামায়েলে তিরমিযী ৩৪)

কিন্তু যেহেতু শুধুমাত্র তেলের কারণে চুল সুন্দর হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত চুলকে পরিপাটি করা হবে না। চুল আঁচড়ালে একদিকে যেমন চুলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়, অপরদিকে তার ব্যক্তিত্বে ভাবগাম্ভীর্যতা সৃষ্টি হয়। অনেক সময় রাসূল (সা.)-এর সম্মানিতা স্ত্রীরা এ খেদমত আঞ্জাম দিতেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) (মৃ ৫৭হি.) বলেন–

كنت ارجل رأس رسول الله ﷺ

আমি রাসূল (সা.)-এর মাথার চুল পরিপাটি করে দিতাম। (শামায়েলে তিরমিযী ৩১)

রাসূল (সা.) এলোমেলো চুল শুধু নিজে রাখতেন না, তা নয়, বরং অন্য কারো বিক্ষিপ্ত চুল দেখলে রাগান্বিত হয়ে যেতেন এবং চুলকে পরিপাটি করার আদেশ দিতেন। ইমাম মালেক (রহ.) (৯৫-১৭৯ হি.) একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন–

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হল। উক্ত লোকের দাড়ি ছিল বিক্ষিপ্ত এবং মাথার চুল ছিল এলোমেলো। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে চুল পরিপাটি করতে আদেশ দিলেন। তিনি চুল পরিপাটি করে এলে রাসূল (সা.) বললেন, তোমার এ অবস্থায় আসা উত্তম নাকি শয়তানের মতো বিক্ষিপ্ত চুল নিয়ে আসা উত্তম? (মুআত্তা মালেক)

এমনিভাবে হযরত জাবের (রা.) (মৃ ৭৪ হি.)-এর বর্ণনায় আছে, এক ব্যক্তি বিক্ষিপ্ত চুল নিয়ে রাসূল (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হলে রাসূল (সা.) রাগান্বিত হয়ে বললেন–

ماكان يجد هذا ما يسكن به راسه

সে কি চুল পরিপাটি করার জন্য কোনো বস্তু পেল না? (মেশকাত ৪৩৫১)

এসব বর্ণনা থেকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, সৌন্দর্যের এদিককে রাসূল (সা.) কত গুরুত্ব প্রদান করতেন? কিন্তু চুল আঁচড়ানোর ক্ষেত্রেও রাসূল (সা.) মধ্যপন্থা অবলম্বন করতেন। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা.) সূত্রে বর্ণিত আছে–

نهى رسول الله ﷺ عن الترجل الاغبا

রাসূল (সা.) বারবার মাথা আঁচড়াতে নিষেধ করেছেন। (শামায়েল ৩৪)

শুধু এটুকুই শেষ নয় বরং মাথার চুল ছাড়াও রাসূল (সা.) দাড়ি ও মোচের ক্ষেত্রেও এ পদ্ধতিই অবলম্বন করতেন। কেননা আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরুষের জন্য এগুলো বিশেষ নেয়ামত ও সৌন্দর্যবর্ধক। কিন্তু দাড়ি ও মোচের

ক্ষেত্রে বিধান ভিন্ন। দাড়ি লম্বা করার এবং মোচ ছোট করার বাণীই উচ্চারিত হয়েছে রাসূল (সা.)-এর পবিত্র ভাষায়। মোচ সম্পর্কে রাসূল (সা.)-এর বাণী হচ্ছে–

من لم ياخذ شاربه فليس منا

যে ব্যক্তি স্বীয় মোচ কাটবে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (নাসাঈ শরীফ হাদীস নং ৫০৬২)

আদিকার যুগ থেকে এক শ্রেণীর লোক দাড়ি কাটা, মোচ লম্বা করা এবং মহিলাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করাকেই সৌন্দর্য মনে করে থাকে। কিন্তু যেহেতু এই সৌন্দর্য মানবপ্রকৃতির সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। তাই এ পদ্ধতি অবলম্বন করা থেকে রাসূল (সা.) কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। বর্ণিত হয়েছে– احفوا الشوارب واعفوا اللحى তোমরা মোচ ছেঁটে ফেলো এবং দাড়িকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দাও। (নাসাঈ শরীফ হাদীস নং ৫০৬০)

অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عشرة من الفطرة منها قص الشارب

এই হাদীসে মোচ কাটাকে মানবপ্রকৃতি হিসেবে অবহিত করা হয়েছে। (মেশকাত ও নাসাঈ)

খেযাব বা মেহেদী ব্যবহার :

চুল সাদা হওয়া একটি স্বভাবগত বিষয়। কিন্তু এর ফলে যৌবনের সজীবতায় ভাটা অনুভূত হয় এবং বাহ্যিক সৌন্দর্য কমে যায়। তাই প্রাচীনকাল থেকেই চুলের শুভ্রতা বিদূরিত করার জন্য বিভিন্ন প্রকার ওষুধপত্র এবং খেযাবের ব্যবহার চলে আসছে। নবী করীম (সা.) একজন মানবসন্তান হিসেবে তিনিও বাল্যকাল, যৌবনকাল এবং বার্ধক্যের বিভিন্ন স্তর পাড়ি দিয়েছেন। রাসূল (সা.)-এর চুল মুবারকে শুভ্রতা যখন আপন ডালপালা বিস্তার করতে আরম্ভ করল, তখন নবী করীম (সা.) স্বীয় চুলে মেহেদির প্রাকৃতিক কলপ লাগিয়ে রঙিন করেন। হযরত আবু রিমছা (রা.) বলেন,

اتيت انا وابى النبى ﷺ وكان قد لطخ لحيته بالحناء

আমি এবং আমার পিতা নবী (সা.)-এর দরবারে আসলাম। তখন আমি রাসূল (সা.)-এর দাড়ি মুবারকে মেহেদি লাগানো অবস্থায় দেখেছি। (নাসাঈ শরীফ ৫০৯৮)

হযরত আবু যার (রা.) (মৃ ৩২ হি.)-এর বর্ণনায় মেহেদী এবং ওয়াসমাহ (কলপ লাগানোর পাতাবিশেষ) কে নবী করীম (সা.) সর্বোৎকৃষ্ট খেযাব আখ্যায়িত করেছেন। (নাসাঈ শরীফ)

এখানেও রাসূল (সা.) ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন, ধর্মীয় কৃষ্টি-কালচারের বিশেষত্বকে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রসিদ্ধ ইসলামী স্কলার আল্লামা ইউসুফ কারযাবীর বক্তব্য শুনুন। তিনি বলেন, ইহুদি খ্রিস্টানরা খেযাব লাগিয়ে চুলের রং পরিবর্তন করার পক্ষপাতী না। তাদের ধারণা ছিল সৌন্দর্য এবং সৌকর্য দ্বীনদারী এবং তাকওয়ার পরিপন্থী। পাদ্রী এবং ধর্মের সীমালঙ্ঘনকারী সাধকদের কাজই ছিল এটি। কিন্তু নবী করীম (সা.) তাদের এ কর্মপদ্ধতিকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে উম্মতে মুহাম্মদিয়াকে নতুন কর্মপদ্ধতির দিকে পথপ্রদর্শন করেন।

চক্ষু মুবারকের কিছু সৌন্দর্য বর্ণনা :

চোখ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য মহা নেয়ামত। এদিকে ইঙ্গিত করে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন

هل يستوى الاعمى والبصير

অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? (সূরা আনআম ৫০)

এরপর নিজেই উত্তর দেন–

وما يستوى الاعمى والبصير

দৃষ্টিমান ও দৃষ্টিহীন সমান নয়। (সূরা ফাতির ১৯)

দৃষ্টিশক্তি বা চোখের যখন এত গুরুত্ব তখন এর হেফাজত করা প্রয়োজন এবং এর সৌন্দর্যের প্রতি খেয়াল করাও আবশ্যক। চোখের সৌন্দর্যবর্ধনে প্রাচীনকাল থেকে সুরমার ব্যবহার চলে আসছে। সুরমা শুধু চোখের সৌন্দর্যই বৃদ্ধি করে না বরং চোখের শুষ্কতা ও ধুলাবালিও দূর করে। সাথে সাথে সুরমার ব্যবহারে ভ্রু সুন্দর ও লম্বা হয়। হযরত জাবের (রা.) (মৃ ৭৪ হি.) সূত্রে বর্ণিত আছে–

عليكم بالاثمد عند النوم فانه يجلوا البصر وينبت الشعر۔

নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, তোমরা শোয়ার সময় অবশ্যই ইসমিদ সুরমা ব্যবহার করবে। কেননা তা চোখের জ্যোতি বাড়ায় এবং চোখের ভ্রু জন্মায়। (শামায়েলে তিরমিযী ৫০)

নবী করীম (সা.) নিজেও প্রতিদিন সুরমা লাগাতেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) (মৃ. ৬৮ হি.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন–

كان النبى ﷺ يكتحل قبل ان ينام بالاثمد ثلثا۔

রাসূল (সা.) শোয়ার পূর্বে উভয় চোখে তিনবার করে ইসমিদ সুরমা ব্যবহার করতেন। হাদীসের বর্ণনাকারী য়াযীদ বলেন, রাসূল (সা.)-এর একটি সুরমাদানি ছিল। (শামায়েল ৪৯)

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে এ কথাই প্রতিভাত হলো যে, দুই কারণে সুরমা লাগানো হয়। এক সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে। দুই. উপকার লাভের জন্য।

লজ্জা এবং দৃষ্টিশক্তি :

চোখের সৌন্দর্য পূর্ণতায় পৌঁছবে না, যতক্ষণ না দৃষ্টিশক্তিতে লজ্জার উপাদান থাকবে না। কেননা, লজ্জা একটি চারিত্রিক মাধুর্য, যা ব্যতীত একজন মুমিনের ঈমানও কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে না। এ দিকেই ইঙ্গিত করে হাদীস শরীফে বার্ণিত হয়েছে–

اكمل المومنين ايمانا احسنهم خلقا۔
ঈমানের দিক থেকে সবচেয়ে পূর্ণ ঈমানদার ওই ব্যক্তি যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর। (মেশকাত শরীফ হাদীস নং ৫১০১)

শরীয়তে লজ্জাকে ঈমানের অপরিহার্য অংশ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। হাদীস শরীফে স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে–

الحياء شعبة من الايمان۔
লজ্জা ঈমানের অংশ। (মেশকাত শরীফ)

যেমনিভাবে লজ্জা ব্যতিরেকে ঈমান পূর্ণতায় পৌঁছার প্রশ্নই আসে না তেমনিভাবে লজ্জা ছাড়া সৌন্দর্য ও অপূর্ণই রয়ে যাবে। লজ্জার গুরুত্ব এ কথা থেকেও অনুধাবন করা যায় যে, জান্নাতের হুর, যাদের পুরো শরীরই সৌন্দর্যে ভরপূর তাদের লজ্জার গুণকে মহান আল্লাহ নেয়ামত হিসেবে উল্লেখ করে ইরশাদ করেন–

فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ

জান্নাতে থাকবে আনতনয়না রমণীগণ, কোনো জিন ও মানব পূর্বে যাদেরকে ব্যবহার করেনি। (সূরা রহমান ৫৬)

দৃষ্টিকে সংযত ও অবনত রাখা লজ্জার পরিচায়ক। যার যত বেশি লজ্জা থাকবে, তার ব্যক্তিত্ব ও সৌন্দর্য ততটুকুই বৃদ্ধি পাবে। এই গুণের কারণেই রাসূল (সা.) ছিলেন অনন্য চরিত্রের অধিকারী। চরিত্রের এই সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দেখেই রাসূল (সা.)-এর কবি হাসসান ইবনে সাবিত (রা.) স্বতঃস্ফূর্তভাবে গেয়ে উঠেছিলেন–

واحسن منك لم ترقط عينى
واجمل منك لم تلد النساء

হে নবী! আপনার চেয়ে সুন্দর কোনো কিছু আমার চক্ষু অবলোকন করেনি কভু এবং আপনার চেয়ে সুদর্শন কাউকে কোনো নারী জন্ম দেয়নি। (দেওয়ানে হাসসান ইবনে সাবিত (রা.)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) (মৃ ৭৪ হি.) রাসূল (সা.)-এর লজ্জা সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেন,

كان رسول الله ﷺ اشد حياء من العذراء فى خدرها

রাসূল (সা.) পর্দানশীন কুমারীর চেয়েও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। (শামায়েলে তিরমিযী ৩৪৩, সহীহে মুসলিম ৫৯৮৬)

পোশাক-পরিচ্ছদ :

পোশাক-পরিচ্ছদ মানবীয় গুণাবলির অঙ্গ এবং চাহিদা। যার মাধ্যমে সে নিজের লজ্জাস্থান ঢেকে রাখে। বাহ্যিকভাবে এই গুণটিই মানবজাতিকে অন্যান্য সৃষ্টি থেকে পৃথক করে।

এই মানবীয় গুণের কারণেই সর্বপ্রথম মানব হযরত আদম (আ.) ও মা হাওয়া (আ.) কে যখন শয়তান ধোঁকা দিয়ে তাদের শরীর থেকে জান্নাতের পোশাক খুলে ফেলে, তখন তারা গাছের পাতা দিয়ে স্বীয় লজ্জাস্থান ঢাকতে চেষ্টা করেন। (সূরা আ'রাফ ২২-২৬, সূরা ত্বাহা ১২১)

পোশাক পরিধান করে মানবজাতি এক দিকে স্বীয় লজ্জাস্থান ঢাকে, অপরদিকে তার সৌন্দর্য ও সৌকর্য বৃদ্ধি করে।

ইসলাম ধর্মে পোশাক পরিধান শুধু বৈধই নয় বরং ইসলামের কাম্যই হচ্ছে মুসলমান যেন আল্লাহর সৃষ্টি পোশাক-পরিচ্ছদ এবং উত্তম কাপড় পরিধান করে নিজের বাহ্যিক সৌন্দর্য বর্ধন করে। (ইসলাম মে হালাল ওয়া হারাম ১০৬)

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও মানবীয় এই চাহিদা সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিভিন্ন সময় সাদা, ডোরাকাটা লাল এবং সবুজ কাপড় ব্যবহার করেছেন। সাধাসিধে পোশাক যেমন পরিধান করেছেন, মূল্যবান কাপড়ও ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সর্বদা মধ্যপন্থারই অনুসরণ করতেন। সাদা পোশাক শুধু সৌন্দর্যই বর্ধন করে না বরং মানুষের ব্যক্তিত্বেও প্রভাব সৃষ্টি করে। রাসূল (সা.) সাদা কাপড় শুধু নিজের জন্যই নির্বাচন করেননি বরং উম্মতকেও তা পরিধান করতে উৎসাহিত করেছেন।

البسوا من ثيابكم البياض فانها اطهر واطيب وكفنوا فيها موتاكم۔
তোমরা সাদা কাপড় পরিধান করো, কেননা তা অধিক পবিত্র ও পরিষ্কার। মৃতদেরকে সাদা কাপড়েই কাফন দাও। (নাসাঈ ৫৩৩৭)

রাসূল (সা.)-এর দ্বিতীয় পছন্দনীয় ছিল হিবারাহ। অর্থাৎ ইয়ামানি ডোরাকাটা চাদর। যেমন বুখারী, মুসলিম ও নাসাঈ শরীফের রেওয়ায়াতে হযরত আনাস (রা.) বলেন–

كان احب الثياب الى النبى ﷺ الحبرة
রাসূল (সা.)-এর কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় পোশাক ছিল ইয়ামানি ডোরাকাটা চাদর। (নাসাঈ ৫৩৩০)

সেরূপ রাসূল (সা.) সবুজ কাপড়ও পরিধান করেছেন। আবু রিমসাহ (রা.) বলেন–

خرج علينا رسول الله ﷺ وعليه ثوبان اخضران
রাসূল (সা.) দুটি সবুজ কাপড় পরিহিত অবস্থায় আমাদের সামনে উপস্থিত হন। (নাসাঈ শরীফ ৫৩৩৪)

এসব কাপড় পরিধান করার ক্ষেত্রে অহংকার দম্ভ বা বাড়াবাড়ির লেশমাত্রও ছিল না। এমনকি অন্য কাউকেও অহংকার বা লোক দেখানোর জন্য কাপড় পরা থেকে তিনি কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন–

من جر ثوبه مخيلة فان الله تعالى لم ينظر اليه يوم القيامة۔
যে ব্যক্তি অহংকারবশত কাপড় হেঁচড়িয়ে

চলাফেরা করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দৃষ্টিপাতও (করুণা এবং দয়া) করবেন না। (নাসাঈ শরীফ ৫৩৪৩)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদিকে যেমন অহংকার বা লোক দেখানোর জন্য পোশাক পরা থেকে নিষেধ করেছেন তেমনিভাবে ময়লাযুক্ত কাপড় পরিধান করাকেও অপছন্দ করতেন। কাউকে ময়লাযুক্ত পোশাক পরিহিত দেখলে তিনি রাগান্বিত হয়ে যেতেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে ময়লাযুক্ত কাপড় পরে আছে, তখন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নারাজ হয়ে বললেন–

ماكان يجد هذا ما يغتسل به ثوبه۔

সে কি কাপড় পরিষ্কার করার জন্য কিছুই পেল না? (নাসাঈ শরীফ)

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রত্যেককে সাধ্যানুযায়ী ভালো পোশাক পরতে উৎসাহ প্রদান করতেন। কৃপণতা করা বা সৌন্দর্যের প্রতি অবজ্ঞা দেখানো উচিত নয়। মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বলে হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) (মৃ ৫২ হি.) সূত্রে বর্ণিত, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

من انعم الله عليه نعمة فان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده۔

আল্লাহ তা'আলা যাকে নেয়ামত দান করেছেন, সে যেন নেয়ামত প্রকাশ করে। কেননা আল্লাহ তা'আলা তার বান্দার ওপর তার নেয়ামতের প্রকাশ দেখতে চান। এ ধরনের রেওয়ায়াত আরো আছে। কিন্তু নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

অহংকার বা মহিলাদের সাদৃশ্য কাপড় পরিধান সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারবাণী উচ্চারণ করেছেন। বিশেষ করে রেশমি কাপড় সম্পর্কে হাদীসের ভাষা অত্যন্ত কঠোর। একবার হযরত উমর (রা.) (মৃ ২৩ হি.) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য একটি ডোরাকাটা রেশমের চাদর নিয়ে এলেন। যাতে বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের সাথে সাক্ষাৎ করার সময় হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এটা পরিধান করতে পারেন। চাদরটি দেখে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন–

انما يلبس هذه من لا خلاق له فى الاخرة۔

এই কাপড় তো ওই ব্যক্তিই পরিধান করতে পারে, যার জন্য পরকালে কোনো অংশ নেই। (নাসাঈ শরীফ ৫৩১০)

দাঁতের পরিচ্ছন্নতা এবং শুভ্রতা :

চেহারার সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে দাঁতের গুরুত্ব অপরিসীম। দাঁত যতই সুন্দর হোক না কেন তাকে যদি পরিষ্কার করা না হয় তাহলে দুর্গন্ধের কারণে কেউ তার পাশেও বসতে চায় না। এ জন্য নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় দাঁত মুবারককে অত্যন্ত যত্নের সাথে পরিষ্কার করতেন। এ কাজ ছিল তাঁর জন্য অত্যন্ত স্বাভাবিক। কারণ তিনি ছিলেন ইসলামের প্রবর্তক, ইসলামী সাম্রাজ্যের অধিপতি এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধান আমীর উমারা এবং বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতরা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসতেন। তিনি তাদেরকে ঈমানের দাওয়াত এবং ধর্মীয় বিধিবিধান শিক্ষা দিতেন। দাওয়াতের ক্ষেত্রে অন্তরের পরিশুদ্ধির সাথে সাথে বাহ্যিক আকৃতির পবিত্রতার বিকল্প নেই। এ কারণেই দাওয়াতের প্রাথমিক অবস্থায় মহান আল্লাহ এ দিকে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে ইরশাদ করেন–

يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر

হে চাদরাবৃত! উঠুন, সতর্ক করুন, আপন পালনকর্তার মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন, আপন পোশাক পবিত্র করুন এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন। (সূরা আল মুদ্দাসসির ১-৫)

শরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে মুখ এবং দাঁতের পরিচ্ছনতার গুরুত্ব সীমাহীন। এ কারণে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মেছওয়াকের ওপর খুব বেশি গুরুত্বারোপ করেছেন। একবার নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

لو لاان اشق على امتى لا مرتهم بتاخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة۔

আমার উম্মতের কষ্ট হবে এই ভয় যদি না থাকত তাহলে আমি তাদেরকে এশার নামায বিলম্ব করার এবং প্রত্যেক নামাযের জন্য মেছওয়াক করার আদেশ দিতাম। (মিশকাত শরীফ)

মেছওয়াকের প্রতি এত বেশি গুরুত্বারোপের কারণ সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে রাসূল (সা.) অন্যত্র ইরশাদ করেন–

السواك مطهرة للفم ومرضات للرب۔

মেছওয়াকের মাধ্যমে মুখের পবিত্রতা এবং রবের সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। (মেশকাত শরীফ)

অন্যকে উৎসাহ প্রদান করার সাথে সাথে স্বয়ং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মেছওয়াক করতেন।

একটি হাদীসে আছে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন ঘরে প্রবেশ করতেন, নিদ্রা থেকে জাগ্রত হতেন এবং অযু আরম্ভ করতেন তখন সর্বপ্রথম মেছওয়াক করতেন। (মিশকাত শরীফ)

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) (মৃ ৫৭ হি.) বলেন–

كان النبى عليه السلام ليستاك فيعطينى

السواك لاغسله فابدأ به فاستاك ثم اغسله وادفعه اليه۔

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মেছওয়াক করে, আমাকে দিয়ে দিতেন, যেন আমি ধুয়ে মেছওয়াক করি। অতঃপর আমি মেছওয়াক করে ধুয়ে তা হুজুর (সা.) কে পুনরায় ফিরিয়ে দিতাম। (মিশকাত)

খুশবু বা সুগন্ধি ব্যবহার :

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খুব গুরুত্বের সাথে সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ঘাম মুবারক সুগন্ধময় হওয়া সত্ত্বেও সর্বদা আতর ব্যবহার করতেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দেহ মুবারক থেকে সুবাস ছড়াত। হযরত আনাস (রা.) (মৃ ৯৩ হি.) বলেন–

ما شممت ريحاقط ولا مسكاولا عنبرا اطيب من ريح رسول الله ﷺ

আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ঘাম মুবারকের চেয়ে সুগন্ধময় আর কিছু শুঁকিনি। না মেশকে আম্বর না অন্য কোনো সুগন্ধি।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কত বেশি সুগন্ধি ব্যবহার করতেন তা নিম্নোক্ত বর্ণনা থেকে বোঝা যায়।

انه اذا مر من طريق وجد وا منه رائحة الطيب وقالوا مر رسول الله ﷺ من هذا الطريق۔

রাসূল (সা.) যে পথ দিয়ে যেতেন পরবর্তীতে কোনো পথিক সে পথ দিয়ে গেলে বুঝতে পারত যে, রাসূল (সা.) এ পথে গমন করেছেন। (মুসনাদে আবু ইয়া'লা)

হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূল (সা.)-এর একটি আতরদানি ছিল। তা থেকে তিনি আতর ব্যবহার করতেন। (শামায়েলে তিরমিযী ২০৮)

কাউকে আতর হাদিয়া দেয়া হলে তা ফিরিয়ে দিতে রাসূল (সা.) নিষেধ করেছেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) (মৃ ৫৭ হি.) সূত্রে বর্ণিত নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন–

من عرض عليه ريحان فلا يرد فانه خفيف المحمل طيب الريح۔

কাউকে রায়হান (উন্নতমানের সুগন্ধি বিশেষ) হাদিয়া দেওয়া হলে সে যেন তা ফিরিয়ে না দেয়। কেননা তা বহনে হালকা এবং সুগন্ধময়। (মুসলিম শরীফ)

আবার রাসূল (সা.) তিনটি বস্তুকে নিজের কাছে সবচেয়ে প্রিয় বলে আখ্যা দিয়ে ইরশাদ করেন, আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় বস্তু হলো সুগন্ধি এবং নারী। নামায আমার চোখের শীতলতা।

সারাংশ :

নবী চরিত্রের বাহ্যিক সৌন্দর্যের আলোচনা থেকে একথাই প্রতীয়মান হলো যে, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) আমাদের জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণীয়, অনুকরণীয়। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নবীর সুন্নাতকেই আমাদেরকে আলোকবর্তিকা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে অবশিষ্ট জীবনে নবী (সা.)-এর সুন্নাহর অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সুস্থ ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে এগিয়ে যাবে আল-আবরার

নিউ রূপসী কার্পেট

সকল ধরনের কার্পেট বিক্রয় ও সরবরাহের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

স্বত্বাধিকারী : হাজী সাইদুল কবীর

৭৩/এ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।
ফোন : ৮৬২৮৮৩৪, ৯৬৭২৩২১

বি.দ্র. মসজিদ মাদরাসার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ থাকবে

সীরাতের একটি নিভৃত অধ্যায় 'রাবায়েবুন্নবী'

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

রাবায়েব শব্দটি রবীবুন এর বহুবচন। রবীব বা রবীবায়ে রাসূল অর্থ নবীজি (সা.)-এর স্নেহের পরশে লালিত উম্মুল মুমিনীনদের পূর্বের স্বামীর সন্তান-সন্ততি। বিষয়টি নবীচরিতের এমন একটি অধ্যায়, যা সীরাত লেখকগণ অনেকটা অগুরুত্বের সাথে প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক আকারেই উল্লেখ করেছেন। অথচ এদের সকলেই মহানবী (সা.)-এর তত্ত্বাবধানে আজীবন নবী (সা.)-এর স্নেহে ধন্য হয়েছিলেন। নববী শিক্ষা, মায়া-মমতা তাঁদের যে সুউচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে দিয়েছিল তার বিবরণ সীরাতুন্নবীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

যে মহান সত্তার সীরাতের আলোকবর্তিকা প্রত্যেক যুগকে আলোকিত করে এসেছে, যার জীবনচরিত নিয়ে পুরো মানবতার ইতিহাস গর্বিত, যার আলোচনা হেদায়াত পথের একমাত্র পাথেয় তাঁর জীবনের এই দিকটা বেমালুম নিভৃতেই থাকুক তা হয় না। বরং এটিকে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে, নবীজির স্নেহ ভালোবাসা, মায়া-মমতাপূর্ণ আখলাক এবং তাঁর অনন্য শিক্ষা ও তারবিয়াতের মাধ্যমে এই লোকগুলো কত বড় মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন, কেমন কেমন কৃতিত্ব রাখতে তাঁরা সক্ষম হয়েছিলেন তা প্রকাশ করে মানবতার কল্যাণে নবীজির আদর্শই পরিপূর্ণ ও অনন্য তা প্রমাণ করা জরুরি।

রাসূল (সা.)-এর দাম্পত্য জীবনে সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জনকারী পবিত্র নারীদের মধ্যে হযরত আয়েশা (রা.), হযরত জুয়াইরিয়া (রা.) এবং হযরত মারিয়া ব্যতীত সকলে হয়ত বিধবা ছিলেন অথবা তালাকপ্রাপ্তা। তাদের কারো কারো সন্তান-সন্ততিও ছিল। যাদের আহার-বিহার, শিক্ষা ও তারবিয়াতের যাবতীয় দায়িত্ব বহন করেছিলেন স্বয়ং নবী করীম (সা.)। তাঁরা সকলে নবী (সা.)-এর তত্ত্বাবধানেই লালিত হন। যাদের নাম নিম্নরূপ :

১। হযরত হিন্দ ইবনে নাবাশ ইবনে যেরারা তামীমী।

২। হযরত হালা ইবনে নাবাশ।

৩। হযরত তাহের ইবনে নাবাশ।

৪। হযরত হিন্দ বিনতে আতীক ইবনে আয়েদ মাখযুমী।

৫। হযরত সালামা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল আসদ।

৬। হযরত উমর ইবনে আবী সালামা।

৭। হযরত দুররাহ বিনতে আবী সালামা।

৮। হযরত যায়নাব বিনতে আবী সালামা।

৯। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে সুকরান ইবনে আমর।

১০। হযরত হাবীবা বিনতে আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ।

এদের মধ্যে প্রথম চারজন হযরত খাদীজা (রা.)-এর সন্তান। যিনি নবুওয়াতের পূর্বে নবী (সা.)-এর বিয়েতে আবদ্ধ হন। এরপর ৫ থেকে ৮ পর্যন্ত চারজন হযরত উম্মে সালামার সন্তান। যিনি চতুর্থ হিজরীতে নবী করীম (সা.)-এর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। হযরত আব্দুর রহমান হযরত সাওদা (রা.)-এর এবং হযরত হাবীবা (রা.) হযরত রমলা তথা হযরত উম্মে হাবীবার ঔরষজাত সন্তান।

উম্মুল মুমিনীনের উল্লিখিত সন্তান-সন্ততির লালন-পালন, তত্ত্বাবধান, শিক্ষা-দীক্ষা ও তারবিয়াতের পরিপূর্ণ দায়িত্বভার নবী করীম (সা.) গ্রহণ করেছিলেন। এমন সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে তাদের লালন করা হয়েছে, যার কারণে তাঁরা প্রত্যেকে জলীলুল কদর সাহাবী রূপে আবির্ভূত হন। তাঁরা ইসলামের দায়ী, মুবাল্লিগ, জিহাদের ময়দানে মুজাহিদ, নবী (সা.)-এর স্বার্থক বাণীর প্রচারক, নবী (সা.)-এর পরিপূর্ণ অনুসারী এবং তাঁর শিক্ষার বাস্তব প্রতিমূর্তি হিসেবে গড়ে ওঠেন।

হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা.)-এর প্রথম বিয়ে আবু হালা নাব্বাস ইবনে যেরারা তামীমীর সাথে হয়। যার ঔরষে তিনটি সন্তান জন্ম নেয়। হিন্দ, হালা এবং তাহের। তাঁর দ্বিতীয় বিয়ে হয় আতিক ইবনে আয়েদ মাখযুমীর সাথে। তাঁর ঔরষ থেকে জন্ম নেন হিন্দ বিনতে আতীক। হযরত খাদীজা (রা.)-এর শাদী কার সাথে আগে হয়েছে এবং কার ঔরষে কতজন সন্তান, তা নিয়ে সীরাতবেত্তাগণের কিছু মতপার্থক্য থাকলেও এ ব্যাপারে একমত যে, নবীজি (সা.)-এর সাথে হযরত খাদীজা (রা.)-এর শাদী হওয়ার পর এই চারজনের যাবতীয় দায়িত্বভার স্বয়ং নবী করীম (সা.) গ্রহণ করেন।

হিন্দ ইবনে আবী হালা :

হিন্দ ইবনে আবী হালা হযরত খাদীজা (রা.)-এর প্রথম সন্তান। যিনি নবী করীম (সা.)-এর নবুওয়াতের ২৫ বছর পূর্বে নাব্বাস ইবনে যেরারার ঔরষে জন্ম নেন। তাঁর প্রকৃত নাম সম্পর্কে

ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য পাওয়া যায়। কারো মতে, তাঁর নাম নাব্বাস ইবনে যেরারা, কারো মতে, মালেক ইবনে যেরারা ইবনে নাব্বাস, কারো মতে, মালেক ইবনে নাব্বাস ইবনে যেরারা, অনেকে বলেছেন, আবু হালা হিন্দ ইবনে নাব্বাস ইবনে যেরারা।

হযরত খাদীজা (রা.) যখন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন তখন হিন্দও তাঁর মায়ের সাথে নবী করীম (সা.)-এর আশ্রয়ে আসেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠেন, যার প্রভাব তাঁর জীবনে স্পষ্টরূপে দেখা যায়। কথাবার্তা, চালচলন তথা প্রতিটি আমলে তাঁকে নবী (সা.)-এর তারবিয়াতের প্রতিবিম্ব হিসেবে পাওয়া যায়। তাঁকে নবী করীম (সা.) অতিমাত্রায় আদর ও স্নেহ করতেন। নবী (সা.) পিতৃস্নেহের পুরোটাই প্রকাশ করেন তাঁর সাথে। ইসলামের আবির্ভাবের সময় যারা প্রথম প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে হিন্দও অন্যতম। তিনিও নবী করীম (সা.)-এর পিতৃস্নেহের পাশাপাশি নবুওয়াতের হক্ব আদায় করতে সক্রিয় ছিলেন। প্রায় সময়ই নবী (সা.)-এর সাথে সাথেই থাকতেন।

হিন্দ ইবনে আবী হালা নবীজি (সা.)-এর সাথে বদর এবং উহুদযুদ্ধেও শরীক ছিলেন। নবীজি (সা.)-এর শামায়েল বর্ণনা ও তাঁর প্রশংসায় হিন্দ ইবনে হালার বিশেষ অবদান আছে। নবী (সা.)-এর দৌহিত্র হযরত হাসান (রা.) হযরত হিন্দ ইবনে হালাকে খুব ভক্তির সাথে 'আমার মামা' বলে সম্বোধন করতেন। তাঁর সম্পর্কে বলেন–

سالت خالى هند بن ابى هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله ﷺ وانا اشتهى ان يصف لى منها شيئا اتعلق به فقال-

"আমি আমার মামা হিন্দ ইবনে আবী হালা যিনি নবীজি (সা.)-এর শামায়েল বর্ণনায় অবদান রেখেছেন আমি তাকে নবী (সা.) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন...।"

হযরত আলী (রা.)-এর সাথেও তাঁর বিশেষ সম্পর্ক ছিল। জামাল যুদ্ধে হযরত আলীর পক্ষে যুদ্ধ করে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর সন্তানাদির মধ্যে তাঁর নামেই একজন হিন্দ ছিলেন। তিনি বড় মুহাদ্দিস ও ফকীহ ছিলেন। তিনি তাঁর পিতা হিন্দ থেকেও বেশ কিছু হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের সাথে যুদ্ধে শরীক ছিলেন। বসরায় ইন্তেকাল করেন। তখন মুসলমানগণ বলাবলি করছিলেন, আজ একজন রবীবে রাসূলের ইন্তেকাল হয়েছে, তথা হিন্দ ইবনে হিন্দের ইন্তেকাল হয়েছে। (উসদুল গাবাহ ৫/৭২)

হালা ইবনে আবী যারারাহ :

তিনি হযরত খাদীজা (রা.) দ্বিতীয় সন্তান। তিনিও নাব্বাশ ইবনে যারারা ঔরষজাত সন্তান। তিনি বড় ভাই হিন্দের ন্যায় নবী করীম (সা.)-এর স্নেহে লালিত হন এবং ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে সাহাবীর মর্যাদায় ভূষিত হন। তাঁর মাঝে হযরত খাদীজা (রা.)-এর অনেক চরিত্র ও চালচলনের অভ্যাস বিদ্যমান ছিল। যার কারণে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) আরাম করছিলেন। হঠাৎ হালা সেখানে উপস্থিত হলে স্নেহাবস হয়ে তাকে বুকে টেনে নিয়ে বলে উঠলেন হালা এসেছে, হালা এসেছে। (আল ইসতি'আব, আল্লামা ইবনে আব্দুল বার ২/২১৪)

তাহের ইবনে আবী হালা :

আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) উস্‌দুল গাবাতে ইবনে যেরারার ঔরষে হযরত খাদীজার দুই ছেলের কথা বলেছেন। কিন্তু আল্লামা ইবনে আব্দুল বার তাহের ইবনে আবী হালাকেও হযরত খাদীজার ছেলে এবং হিন্দ ইবনে হালার ভাই আখ্যায়িত করে এভাবে উল্লেখ করেছেন–

طاهر بن ابى هاله التميمى الاسدى اخو هند ربيب النبى ﷺ

যার সমর্থনে হযরত কাতাদার এ কথাও উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেন "আতীক ইবনে আয়েয মাখযুমীর পরে হযরত খাদীজা (রা.)-এর বিয়ে হিন্দ ইবনে নাব্বাস তামীমীর সাথে হয়। সে ঘরে হিন্দ, হালা এবং তাহের নামে তিন সন্তান জন্ম নেন। (হাফেজ ফরুগ, 'আযওয়াজে মুতাহহারাত' ১/৯২)

হযরত তাহের ইবনে আবী হালাও নবী করীম (সা.)-এর স্নেহের পরশে লালিত। নবী (সা.)-এর তারবিয়াত ও শিক্ষা, বাতিলবিরোধী সচেতনতা এবং তাদের মোকাবিলা করার আবেগ তাঁর মাঝে যথার্থই বিদ্যমান ছিল। নবী (সা.)-এর স্নেহ-দৃষ্টি তাঁর প্রতি ছিল এবং তিনি নবীজির নৈকট্য লাভ করেন। ফিতনায়ে এরতেদাদ তথা ধর্মান্তরিত হওয়ার ফিতনার সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের মোকাবিলায় হযরত তাহের ইবনে আবী হালাকেও প্রেরণ করেন। আল্লামা ইবনে আব্দুল বার (রহ.) হযরত আবু মূসা (রা.) সূত্রে হযরত সাইফ ইবনে উমরের কথা এভাবে বর্ণনা করেন– "নবী করীম (সা.) ইয়ামানবাসীর মোকাবিলার জন্য যে পাঁচ ব্যক্তিকে রওনা করেন তাদের মধ্যে ছিলাম আমি, মু'আয ইবনে জবল, তাহের ইবনে আবী হালা, খালেদ ইবনে সাঈদ এবং আক্কাশা ইবনে ছওর। (সীরাতুন্নবী- আল্লামা শিবলী নূমানী ২/৪০৩) তাঁরা অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে মুরতাদদের মোকাবিলা করেন এবং বিজিত হন।

হিন্দ বিনতে আতীক :

নবী (সা.)-এর বিয়েতে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বে হযরত খাদীজা (রা.)-এর তিন

ছেলের পাশাপাশি এক কন্যা থাকার ব্যাপারেও বিভিন্ন সীরাত গ্রন্থে আলোচনা পাওয়া যায়। যার নাম হিন্দ, যিনি আতীক ইবনে আয়েয মাখযূমীর ঔরষজাত ছিলেন। নবী (সা.)-এর সাথে বিয়ে হওয়ার সময় তাঁর ভরণপোষণ ও তত্ত্বাবধানের যাবতীয় দায়ভার নবী করীম (সা.) গ্রহণ করেন।

উপরে ইঙ্গিত করা হয়েছিল হযরত খাদীজা (রা.)-এর প্রথম স্বামী কে তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। এর মধ্যে হযরত কাতাদার মত হলো হযরত খাদীজা (রা.)-এর প্রথম স্বামী আতীক ইবনে আয়েদ মখযুমী। তাঁর মতে, ওই ঘরে হযরত খাদীজা (রা.)-এর কোনো সন্তান ছিল না। কিন্তু বেশির ভাগ ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিসীন খাদীজা (রা.)-এর সন্তানাদির মধ্যে হিন্দ বিনতে আতীকের কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লামা ইবনুল আসীর (রহ.) উসদুল গাবাতে আতীক ইবনে আয়েযের ঔরষে এক কন্যা হিন্দের কথা উল্লেখ করেছেন। সেরূপ ইস্তিআবেও তাঁর উল্লেখ পাওয়া যায়। আল্লামা শিবলী (রহ.) সীরাতুন্নবী গ্রন্থে হিন্দ বিনতে আতীককে হযরত খাদীজা (রা.)-এর কন্যা হিসেবে আখ্যায়িত করে লেখেন এ কারণে হযরত খাদীজা (রা.) কে উম্মে হিন্দা নামে ডাকা হতো। হিন্দ ইসলামের প্রারম্ভকালেই ইসলাম গ্রহণ করার মাধ্যমে সাহাবিয়াতের সূচিতে নাম লেখানোর সৌভাগ্য অর্জন করেন। তিনিও নবী (সা.)-এর স্নেহের পরশে বেড়ে ওঠেন এবং তাঁর সুষ্ঠু, সুস্থ ও অনন্য তারবিয়াতে গড়ে ওঠেন।

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা.) ছিলেন কুরাইশ গোত্রের মাখযুম বংশের। তাঁর আসল নাম হিন্দ। নবী (সা.)-এর দাম্পত্য জীবনে অংশ নেওয়ার পূর্বে তিনি আব্দুল মুত্তালিবের দ্বিতীয় পুত্র বররাহের ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল আসাদের বিবাহ বন্ধনে মিলিত হন। যিনি তাঁর চাচতো ভাই ছিলেন। ইসলামের প্রারম্ভকালে তাঁরা উভয়ই ইসলামের ছায়াতলে দীক্ষিত হন। এমনিভাবে তাঁরা السابقون الاولون এর অংশীদার হন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল আসাদ মদীনা শরীফে হিজরত করেন এবং উহুদযুদ্ধে গুরুতর আহত হয়ে ইন্তেকাল করেন।

তাঁর ঔরষে হযরত উম্মে সালামা থেকে চার সন্তানের জন্ম হয়। আব্দুল্লাহ (রা.)-এর ইন্তেকালের পর হযরত উম্মে সালামা ৪ হিজরীতে নবী করীম (সা.)-এর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তখন এই চার সন্তানের ভরণ-পোষণের যাবতীয় দায়িত্ব নবী করীম (সা.) গ্রহণ করেন। মূলত হযরত উম্মে সালামা (রা.)-এর শুরুতেই ইসলাম গ্রহণ করা, বিভিন্ন কুরবানী ও বিপদ-আপদ সহ্য করা, চার শিশুকে নিয়ে বিধবা হওয়া এবং এ সকল শিশুদের শিক্ষাদীক্ষা ও তারবিয়াত ইত্যাদি বিষয় অনুধাবন করেই নবী করীম (সা.) হযরত উম্মে সালামাকে বিয়ে করে ছিলেন।

সালামা ইবনে আব্দুল্লাহ :

হযরত সালামা হাবশার প্রথম হিজরতের সময় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল আসাদের ঔরষে জন্ম নিয়েছেন। সে কারণে তাঁর নামেই মাতা-পিতা উভয়ের উপনাম হয় আবু সালামা এবং উম্মে সালামা। হাফেজ ইবনে হাজর আসকলানী (রহ.) আল-ইসাবা গ্রন্থে বিষয়টি এভাবে পরিষ্কার করেছেন– هو كان اسن من اخيه عمر অর্থাৎ হযরত সালামা তাঁর ভাই উমর থেকে বড় ছিলেন।

হযরত আবু সালামা ইন্তেকালের পর নবী করীম (সা.) যখন হযরত উম্মে সালামাকে বিয়ে করেন তখন তাঁর চার সন্তানকেও তাঁর দায়িত্বে নেন এবং পিতৃস্নেহে তাদের লালন-পালন করেন। তাদেরকে দ্বীনি শিক্ষা ও তারবিয়াত দ্বারা ধন্য করেন। নবী করীম (সা.) হযরত সালামার সাথে তাঁর চাচাতো বোন উমামা বিনতে হামযা (সায়্যিদুশ শুহাদা) কে বিয়ে দেন। বিয়ের পর সাহাবায়েকেরামকে বলেন – هل ترونى كافاته .

মোট কথা, তিনি নববী স্নেহে পরিপালিত হয়ে নববী আখলাক, চলন-চরিত্র, জাহেরী ও বাতেনী গুণে গুণান্বিত ছিলেন।

উমর ইবনে আবী সালামা :

তাঁর উপনাম আবু হাফস। ২ হিজরীতে হাবশায় জন্মগ্রহণ করেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর বলতেন, আমি উমর ইবনে আবী সালামা থেকে দুই বছরের বড়। খন্দকের যুদ্ধে উভয়ই হযরত হাসসান (রা.)-এর ঘরে ছিলেন। হযরত উমর ইবনে আবী সালামাকে হযরত আলী (রা.)-এর খেলাফত আমলে বাহরাইনের গভর্নর বানানো হয়েছিল। নাহজুল বালাগা কিতাবে তাঁর প্রতি প্রেরিত হযরত আলী (রা.)-এর পত্রের কথা উল্লেখ আছে। যে পত্রে হযরত আলী (রা.) তাকে ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত বিভিন্ন নীতির কথা জানিয়েছেন।

নবী (সা.)-এর তত্ত্বাবধানে তাঁর ইলমী ও আমলী প্রশিক্ষণ থাকায় তিনি ছোটবেলা থেকে শরীয়তের বিভিন্ন দিক নিয়ে চিন্তা-ফিকির, আলোচনা-গবেষণা করতেন। নবী (সা.) তাকে অতি মুহাব্বত করে সব সময় 'ইয়া বুনায়্যা' 'হে আমার সন্তান' নামে সম্বোধন করতেন। তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় আব্দুল মালিক ইবনে মরওয়ানের যুগে ৮৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

দুররা ও যায়নাব বিনতে আবী সালামা :

হযরত উম্মে সালামার উল্লিখিত দুই ছেলের পরে বয়সের তারতম্যে দুররা ও যায়নাব নামে দুজন কন্যাসন্তান ছিল।

যাদের ভরণ-পোষণ ও লালন-পালন করেন নবী করীম (সা.)। বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণ দুররা বিনতে আবী সালামার নাম 'রুকাইয়াহ'ও বলেছেন। এদের মধ্যে দুররা বিনতে আবী সালামা প্রখর ধীশক্তির অধিকারী ছিলেন। আর যায়নাব ছোট হওয়ায় মহানবী (সা.)-এর অতি স্নেহে ধন্য ছিলেন তিনি। নবী (সা.)-এর কাছে তারবিয়াত পাওয়া এবং ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে বেশি সুযোগ পান তিনি। হযরত যায়নাবের বিয়ে হয় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আসওয়াদ আসদীর সাথে। তাঁর ঔরষে ছয় ছেলে এবং তিন কন্যা জন্ম নেন।

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রা.)-এর আসল নাম ছিল রমলা বিনতে আবী সুফিয়ান। নবী (সা.)-এর বিবাহাধীন আসার পূর্বে উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহাসের বিবাহবন্ধনে ছিলেন। তাঁরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ই তখন ইসলাম কবুল করেন। হাবশায় হিজরতের পর উবাইদুল্লাহ খ্রিস্টধর্ম কবুল করে এবং সে ধর্মেই তার মওত হয়। তার ঔরষে এক কন্যা জন্ম নেয়, যার নাম হাবীবা। এর নামেই মা'র নাম উম্মে হাবীবা রাখা হয়।

হাবীবা বিনতে ইম্মে হাবীবা :

হযরত হাবীবার জন্ম হয় মক্কাতে। নবুওয়াতের ষষ্ঠ বছর তাঁর মাতা-পিতার হাবশা হিজরতের সময় তিনিও সাথে ছিলেন। হাবশায় তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশের ইন্তেকাল হয়। এরপর হযরত উম্মে হাবীবা (রা.)-এর বিয়ে নবী করীম (সা.)-এর সাথে হয় এবং খায়বার যুদ্ধের সময় তিনি উম্মুল মুমিনীন হিসেবে মদীনায় তাশরীফ নেন। তখন হযরত হাবীবাও নবীজির (রা.) স্নেহপরশের আওতাভুক্ত হন। (আল-ইসাবা ৪/১৮৯)

তখন থেকে তাঁর যাবতীয় দায়দায়িত্ব নবীজি (সা.) গ্রহণ করেন। তাঁর স্নেহতলে তিনি বেড়ে ওঠেন এবং গড়ে ওঠেন। তিনি প্রাপ্তাবয়স্কা হওয়ার পর বানু সাকীফ গোত্রের সরদার উরওয়া ইবনে মাসউদের সাথে তাকে বিয়ে দেন।

উম্মুল মুমিনীন হযরত সাওদা (রা.)-এর আগের স্বামী হযরত সুকরান ইবনে আমরের ঔরষেও আব্দুর রহমান নামে একজন সন্তানের কথা কয়েকটি সীরাত গ্রন্থে পাওয়া যায়, যার দায়িত্বভার নবীজি (সা.) গ্রহণ করেন। যার ব্যাপারে আল্লামা শিবলী নূমানী (রহ.) সীরাতুন্নবী (সা.) গ্রন্থে লিখেন, হাবশা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর হযরত সুকরান ইন্তেকাল করেন। তাঁর ঔরষে একটি সন্তানের জন্ম হয়। যার নাম আব্দুর রহমান। (সিয়ারুস সাহাবিয়্যাত ৮৩) আযওয়াজে মুতাহহারাত নামক গ্রন্থে আছে, হযরত আব্দুর রহমান ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.)-এর যুগে ইরাকের একটি যুদ্ধে শহীদ হন।

হাদীসের জগতে তাঁদের বিচরণ এবং তাঁদের হাদীস বর্ণনা :

নবীজি (সা.)-এর স্নেহপরশে লালিত ব্যক্তিদের যেভাবে গড়ে ওঠা আবশ্যক নবীজি (সা.)-এর এ সকল পালক সন্তানগণ সেরূপ ব্যক্তিত্ব নিয়ে গড়ে উঠেছিলেন। প্রত্যেকে আদর্শ, আচার-আচরণ, আমল, আখলাক, ইলম ন্যায়পরায়ণতা তথা সর্বক্ষেত্রে আদর্শ ব্যক্তি হিসেবেই গড়ে উঠেছিলেন। একদিকে তাঁরা সুহবাতে নববী (সা.)-এর কারণে সাহাবিয়্যাতের মর্যাদায় ভূষিত ছিলেন। অন্যদিকে অন্যান্য সাহাবীদের ন্যায় কুরআন-হাদীসের ইলমে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। নবীজি (সা.)-এর কাছে থাকায় হাদীস ও সীরাত বিষয়ে তাঁদের জ্ঞান-গরিমার পরিধি ব্যাপক হয়ে ওঠে। তবে হযরত উম্মে সালামার সন্তানগণ হযরত খাদীজা (রা.)-এর তুলনায় এই কাজে বেশি অংশ নিতে পেরেছেন। কারণ তাঁরা বয়সে ছোট থাকায় সব সময় মায়ের সাথে থেকে নবী (সা.) কে কাছে থেকে দেখার বেশি সুযোগ পেয়েছেন। হযরত খাদীজা (রা.)-এর সন্তানগণ বয়সে বড় ছিলেন। বিভিন্ন দ্বীনি কাজ আঞ্জাম দেওয়ার জন্য রাসূল (সা.) তাদের বিভিন্ন স্থানে পাঠাতেন। সে কারণে তারা নবীজি (সা.) কে সব সময় কাছে থেকে দেখার সুযোগ না পাওয়াই স্বাভাবিক। তার পরও হাদীস বর্ণনা ও সীরাতে তাদের বহুবিদ খিদমাত রয়েছে, যা কিতাবাদিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। সেটিও একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়। এর জন্য বড় বড় কিতাবাদি দেখা যেতে পারে।

একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, বর্তমান যুগে রাসূল (সা.)-এর সীরাতের এই অধ্যায়টি পড়া এবং তা থেকে শিক্ষা অর্জন সকল মুসলমানের জন্য অতীব জরুরি। কারণ মুসলমানদের সন্তানাদির মধ্যে বর্তমানে এরূপ সন্তানরাই বেশি অবহেলিত। নারীর ঘরে বা পুরুষের আগের সন্তানাদির প্রতি বেশি অবহেলা করা হয়। এমনকি অনেক সময় এরূপ সন্তানাদি অত্যাচারিত, নিপীড়িত ও জুলুমের জীবন যাপন করে থাকে। পরিবারে এরূপ সন্তানের কোনো মূল্য থাকে না। অনেক সময় নারী বা পুরুষ নিজের স্ত্রী বা স্বামীর ইন্তেকাল কিংবা তালাকের পর নিজের সন্তানাদির দিকে তাকিয়ে নতুন বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হতেও ভয় পায়। এর একমাত্র কারণ হলো এ ক্ষেত্রে নবীজির আদর্শ ও নিপুণ চরিত্রের চর্চা করা হয় না। নবী (সা.) এতজন পালক সন্তানকে কিরূপ স্নেহ ও মায়ামমতা দিয়ে লালন পালন করেছেন তা যদি বর্তমানেও মুসলমানদের ঘরে ঘরে চর্চিত হয় তবে এই সমস্যাটির সমাধান হয়ে যাবে। এ সকল সন্তানগণ অবহেলা ও জুলুম থেকে বেঁচে যাবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন।

AL MARWAH OVERSEAS
recruting agent licence no-rl156

ROYAL AIR SERVICE SYSTEM
hajj, umrah, IATA approved travel agent

হজ, ওমরাসহ বিশ্বের সকল দেশের ভিসা প্রসেসিং ও সকল এয়ারলাইন্স টিকেটিং অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে অল্পখরচে দ্রুত সম্পন্ন করা হয়।

Shama Complex (6th Floor)
66/A Naya Paltan, V.I.P Road
(Opposite of Paltan Thana East Side of City Haeart Market)
Dhaka: 1000, Bangladesh.
Phone: 9361777, 9333654, 8350814
Fax 88-02-9338465
Cell: 01711-520547
E-mail: rass@dhaka.net

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সর্বপ্রকার বাতিলের মোকাবেলায় এগিয়ে যাবে
“আল-আবরার” এই কামনায়

জনপ্রিয় ১৯৩৭ সাবান

প্রস্তুতকারক

হাজী নুরআলী সওদাগর এন্ড সন্স লিঃ

চাক্তাই, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

ফোন : বিক্রয় কেন্দ্র : -০৩১-৬৩৪৯০৫, অফিস: ০৩১-৬৩২৪৯৩, ৬৩৪৭৮৩